আর এক ঝড়

কোথায়? সেটা কোথায়?

চেতনার প্রারম্ভ থেকে অনবরত এই একই প্রশ্ন ক্ষত বিক্ষত করে চলেছে সীতুকে। কোথায়? সেটা কোথায়?

এ প্রশ্ন তাকে মা-বাপের কাছে স্বস্তিতে তিষ্ঠোতে দেয় না, দেয় না সুস্থ থাকতে। থেকে থেকে মন একেবারে বিকল করে দেয়। তখন আর খেলাধূলো ভাল লাগে না সীতুর, ভাল লাগে না কারুর সঙ্গ। খাওয়ার জন্যে মায়ের পীড়াপীড়ি আর বাপের বকুনি অসহ্য লাগে।

এ প্রশ্নকে মন থেকে তাড়াতে অনেক চেষ্টা করেছে সীতু, যত বড় হচ্ছে তত চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কিছুতেই এই অদ্ভুত প্রশ্নের জটিল জালকে ছিঁড়ে খুঁড়ে উচ্ছেদ করতে পারছে না।

সব কিছুর মাঝখানে একটা অদেখা জায়গার ছবি চোখের উপর ভেসে উঠে মনটাকে উন্মনা করে দেয়, আশপাশের কোন কিছু ভাল লাগে না।

সীতুর এই সাড়ে আট বছরের জীবনে কত কত বারই তো মাকে এ প্রশ্ন করেছে সীতু, আর প্রত্যেক বারই তো একই উত্তর পেয়েছে, তবু কেন সংশয় ঘোচে না, তবু কেন আবার ও বলে বসে, 'অনেক দিন আগে আমরা অন্য আর কোথায় ছিলাম মা?'

অতসী কখনো স্নেহে, কখনো বিরক্তিতে, কখনো শান্ত মুখে, কখনো ক্রুদ্ধ মূর্তিতে একই উত্তর দেয়, 'কোথাও নয়, কোথাও নয়। কখনো কোনদিন আর কোথাও ছিলে না তুমি। এখানেই জন্মেছ, এখানেই আছ। কেন অনবরত ওই এক বিশ্রী চিন্তা নিয়ে মাথা ঘুলোও?'

'কেন'! সে কথা কি সীতু নিজেই জানে? সীতু কি ইচ্ছে করে এ চিন্তা মাথায় আনে? এ ছবি কি সীতু নিজে এঁকেছে?

……একটুকরো রোয়াক, কি রকম যেন একটা নল দিয়ে জলপড়া চৌবাচ্চা, ছোট ছোট জানলা বসানো ক'টা যেন ঘর, ঘরের দেওয়াল ভরতি ছবি টাঙানো, আর পাশের কোনদিকে যেন একটা গলি। সরু গলি, মাঝে মাঝে জঞ্জাল জড়ো করা।

আর একটা ছোট ছেলে কোন একটা জানলায় বসে বসে দেখছে সেই গলিতে লোকের আনাগোনা।…

পথ চলতি লোক চলে যায়, ফেরিওলা সুর করে করে ঢোকে আবার বেরিয়ে আসে, রাস্তার ঝাড়ুদার এসে সেই জমানো জঞ্জালগুলো তুলে নিয়ে যায়, ছেলেটা বসে বসে দেখে।

সে ছেলেটা কে?

সে বাড়িটা কোথায়? ঝাপসা ঝাপসা এই ছবিটা আবছা একটা রহস্যলোকের সৃষ্টি করে অনবরত যেন সীতুকে এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়, সীতুদের এই চুনকে বকবকে সাজানো গোছানো প্রকাণ্ড সুন্দর বাড়িটা থেকে। এ বাড়িটাকে কিছুতেই যেন নিজেদের বাড়ি বলে মনে হয় না সীতুর, কিছুতেই এর সঙ্গে শিকড়ের বন্ধন অনুভব করতে পারে না।

সীতুদের বাড়ির বেঁটে নেপালী চাকরটা একটুকরো ন্যাকড়া নিয়ে যেমন করে শার্সির কাঁচগুলো ঘসে ঘসে চক্‌চকে করে, চক্‌চকে করে আলমারির গায়ে লাগানো আর মার চুলবাঁধার লম্বা আয়নাগুলোকে, তেমনি একটা কিছু দিয়ে ঘসে ঘসে চক্‌চকে করে ফেলতে ইচ্ছে করে সীতুর এই ভুলে ভুলে যাওয়া ঝাপসা ঝাপসা ছবিটা। পরিষ্কার আয়নায় মুখ দেখার মত করে দেখতে ইচ্ছে করে সেই ছেলেটাকে। দেখতে ইচ্ছে করে ছেলেটাকে সেই জানলা থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যেতো যে মানুষটা, সে কে?

কী ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে হাতটা তার!

... ...

বাড়ির সমস্ত কোলাহল আর সকলের সঙ্গ থেকে সরে এসে আপ্রাণ চেষ্টায় তলিয়ে যায় সীতু, বসে থাকে মস্ত জানলাটার ধারে, যে জানলাটা এ পাশের ছোট্ট একটা ঘরের, যাতে অন্য অন্য জানলার মত লেসের পর্দা ঝোলানো নেই।

জলখাবার খাবার সময় যে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, চাকরটা যে দু'বার ডেকে গেছে, এইবার যে হাল ধরতে মা আসবেন, এ সবের কোন কিছু খেয়াল নেই সীতুর।

অবশেষে তাই হল।

অতসী নিজেই উঠে এল বিরক্ত হয়ে। হয়তো বই পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে, হয়তো বা আরামের দুপুর-ঘুমটুকু ছেড়ে। বিরক্ত মুখে বলে উঠল, 'সীতু! ফের তুমি গোঁজ হয়ে বসে আছ, খাওয়ার সময় খাচ্ছ না? তোমার জন্যে কী করবো আমি? বল, কী করবো? বাড়ি থেকে চলে যাব?'

'মা'! সীতু অসহায় মুখে বলে, 'সেই বাড়িটা কাদের একবারটি বল না!'

অতসী খুব চীৎকার করে বকে উঠতে গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। বসে পড়ল জানলার ধাপটায় সীতুর পাশে, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সে বাড়িটা নিশ্চয় তোর পূর্বজন্মের বাড়ি, সীতু! আগের জন্মের স্মৃতি তোর মনে পড়ে নিশ্চয়। ও-সব কথা আর ভাবিসনে বাবা!'

'আমি তো ইচ্ছে করে ভাবিনা মা!' সীতু ম্লানমুখে বলে 'আমার যে খালি খালি মনে হয়—'

কি মনে হয়, সে-কথা আর নতুন করে তো বলতে হয় না, অতসী জানে। তাই কোমলতার সঙ্গে ঈষৎ কঠোরতা মিশিয়ে বলে, 'কেন মনে হয়? বাড়ির ছেলেমেয়ে বাড়িতেই জন্মায়, বাড়িতেই থাকে, এই তো জানা কথা। এই যে খুকু, ও কি আগে আর কোথাও

ছিল? এ বাড়িতেই জন্মেছে, এ বাড়িতেই আছে। বল, খুকু কি তোমার বোন নয়? দাদা নও তুমি ওর?'

সীতুর চোখ ছলছলিয়ে জলে ভরে আসে, তবু বলে চলে অতসী, 'বাড়ির ছেলেমেয়ে বাড়িতেই জন্মায়, বাড়িতেই থাকে, বুঝলে? আর কোনদিন ও কথা ভাববে না। আমি বলেছি, অদ্ভুত কোন একটা বাড়ির স্বপ্ন তুমি দেখেছ বোধ হয় কোনদিন, তাই বারেবারে মনে পড়ে। স্বপ্নের কথা মনে রাখতে নেই। চল, খাবে চল।'

ছেলের হাত ধরে নিয়ে যায় অতসী বিষণ্ণমুখে। মুখে যতই বকাবকি করুক, বুকটা কি দমে যায় না তার? কেন সীতুর পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে? কিছুতেই কেন ভুলিয়ে দেওয়া যায় না তাকে তার স্মৃতি?

আপেলের টুকরোগুলো মুখে পুরে মার কথাটা ভাবতে সুরু করে সীতু।

স্বপ্ন!

তাই হয়তো!

স্বপ্ন তো ঝাপসা-ঝাপসাই হয়।

কিন্তু স্বপ্ন কি সব সময় এমন করে টানে?

'দাদ্দা দাদ্দা'! টলতে টলতে খুকু এল মোটা-মোটা গোল-গোল পা ফেলে। ওর ওই পা ফেলাটা যেন ঠিক হাতীর ছানার মত। দেখলেই মনটা আহ্লাদে ভরে যায়। ওর পা ফেলা, ওর খ্যাঁদা-খ্যাঁদা লাল-লাল মুখটা, উড়ু-উড়ু সোনালী চুলগুলো, আর ওর ওই সম্প্রতি নতুন শেখা 'দাদ্দা' ডাক, এটা যেন সব মনখারাপ মুছে দেয়। ওর সঙ্গে খেলায় মেতে উঠতে ইচ্ছে করে।

'দাদ্দা দাদ্দা'! দাদার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খুকু।

'ওরে সোনা মেয়ে, ওরে সোনা মেয়ে!' একটা হাত বাড়িয়ে খুকুকে ধরে নেয় সীতু, বলে—'আপেল খাবে? আপেল? ফল ফল?'

খুকু অদ্ভুত উচ্চারণে দাদার কথার পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করে, 'পঃ পঃ!' তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে দাদার হাতের খাদ্যটা খপ্ করে কেড়ে নিয়ে মুখে ফেলে।

সীতু বিগলিত স্নেহে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, 'ডাকাত মেয়ে, ডাকাত মেয়ে, খন্দেত খাবে? খন্দেত? খুব মিট্টি।'

খুকু বলে, 'মিত্তি।'

দুই ভাই-বোনের কণ্ঠ-নিঃসৃত হাসির শব্দে ঝলসে ওঠে বারান্দাটা। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই হাসির উপর কে যেন বড় একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বাবা। লোকে যাঁকে 'মৃগাঙ্ক ডাক্তার' বলে। কোঁচকানো ভ্রূ, বিরক্ত গম্ভীর কণ্ঠ।

'সীতু!'

সীতু মুখটা নীচু করলো।

'কতদিন বারণ করেছি!'

মুখটা আরও নীচু করলো সীতু।

হ্যাঁ, অনেক দিনই বারণ করেছেন বটে। বাচ্চারা বড়দের এঁটো খায়, এ তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। খুকুকে সীতু নিজের পাত থেকে কিছু খাওয়াচ্ছে দেখলেই এমনি রেগে জ্বলে যান। আজও তাই আস্তে আস্তে স্বর চড়াতে থাকেন, 'একটা ব্যাপারেও কি সভ্য হতে নেই? সব সময় অসভ্যতা, অবাধ্যতা?'

সীতুর মুখটা বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে। বাবার মুখের ওপর কথা বলতে পারে না সে, বাবার সঙ্গে কথাই বলতে পারে না। বাবাকে দেখলেই শুধু ভয় নয়, কেমন একটা রাগ আসে, ভয়ানক একটা রাগ।

আর তিনিও।

তিনিও যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সীতুর সঙ্গে সহজ হয়ে, সহজ গলায় কথা বলবেন না। তাই যখনি কথা বলেন কপাল কুঁচকে বিরক্ত-বিরক্ত গলায়। ছেলেকে শুধু শাসনই করতে হয় এইটাই বোধকরি জানেন সীতুর বাবা। তাই তাঁর সীতুর প্রতি সর্ববিধ ব্যবহার তো বটেই, চোখের চাহনিতে পর্যন্ত শাসন-শাসন ভাব।

'আর কোনদিন খাওয়াবে? বল—জবাব দাও।'

কিন্তু জবাবটা দেবে কে?

সীতুর মাথাটা তো একভাবে নীচু থাকতে থাকতে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তাই বোধ করি জবাব দিতে ছুটে এল অতসী। কিন্তু জবাব না দিয়ে প্রশ্নই করলো, 'কি হল? এখুনি উঠলে যে? বলছিলে যে খুব টায়ার্ড ফিল করছো—'

'টায়ার্ড ফিল্ আমি তোমাদের ব্যবহারে যতটা করি অতসী, ততটা দৈনিক পঁচিশ ঘণ্টা কাজ করলেও নয়'—মৃগাঙ্ক ডাক্তারের গলার স্বরটা থমথমে শোনায়। 'খুব বেশী চাহিদা আমার নয়, সে তুমি জানো। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে তোমার, ছেলেমেয়েকে নিয়ে যা খুশি করবার। শুধু হাত জোড় করে অনুরোধ করি, তোমার আদরের ছেলেটি যেন ওকে ওর পাত থেকে কিছু না খাওয়ায়। সে অনুরোধ রক্ষিত হবে, এটুকু কি আমি আশা করতে পারি না?'

সীতুর চোখটা মাটির দিকে, তবু সীতু বুঝতে পারছে বাবার সেই রুক্ষ মুখটা আরও শক্ত হয়ে পাথুরে পাথুরে হয়ে গেছে, আর মায়ের মুখটা বেচারী বেচারী! মায়ের জন্য এখন কষ্ট হচ্ছে সীতুর, মনে হচ্ছে বেশীর ভাগ সময় তার দোষেই মাকে এই পাথুরে মুখের আগুন-ঝরা চোখের সামনে দাঁড়াতে হয়।

কিন্তু সীতু কি করবে?

খুকুটা যে 'দাদ্দা' বলে ছুটে এসে ওর কাছ থেকে কেড়ে খায়।

কিন্তু শুধুই কি খাওয়া?

সীতু খুকুর গায়ে একটু হাত ঠেকালেই কি অমনি রুক্ষ হয়ে ওঠেন না বাবা? বলেন না—'বড়দের হাত লোনা, ছোটদের গায়ে দিলে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়?'

সীতু কত বড়?

মার চাইতে? বাবার চাইতে? নেপ্‌বাহাদুরের চাইতে?

অনেকবার ইচ্ছে করে সীতুর, বাবাকে জিজ্ঞেস করবে তাঁর ডাক্তারি বইতে ঠিক পষ্ট কি লেখা আছে? লেখা আছে কি শুধু সাত-আট বছরের ছেলেদের হাতই লোনা হয়?

ইচ্ছে করে, কিন্তু পারে না জিজ্ঞেস করতে অদ্ভুত একটা আক্রোশে। বাপের উপর ভয়ানক একটা আক্রোশ আছে সীতুর। সর্বদা শাসনের ফল, না আরও কোন কারণ আছে? কে জানে কি, তবে এইটুকুই দেখা যায়, বাপের সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলে না সে। নিজে থেকে ডেকে তো নয়ই, প্রশ্ন করলে উত্তরও দেয় না। অতসীর ভাষাতে 'গোঁজ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

যেমন আজও।

'কথা কয়ে তো উত্তর পাওয়া যাবে না ওনার সঙ্গে, কাজেই বোঝা যাবে না বারণ করলেও কেন শোনে না'—মৃগাঙ্ক ডাক্তার বিদ্রূপকঠিন কণ্ঠে বলেন, 'তোমাকেই হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, দয়া করে ছেলের এই বদ অভ্যাসটি ছাড়াও।'

অত আদরের খুকু সোনা, তবু তার উপর রাগ এসে যায় সীতুর, মনে মনে তাই বাপের কথার উত্তর দেয়। 'ছেলের বদ অভ্যাসটি তো ছাড়াবেন মা, আর মেয়ের বদ অভ্যাসটি? সামনে খাবার জিনিস দেখলেই খপ্‌ করে মুখে পুরে দেবার অভ্যাসটি? নেপ্‌বাহাদুরের কাছ থেকে ভুট্টা খায় না সে? বামুন ঠাকুরের কাছ থেকে আলুভাজা, বড়াভাজা?'

মনে মনে বলা উত্তর শোনা যায় না।

অতসীকে তাই আলাদা উত্তর দিতে হয়, 'বারণ কি করি না? শুনছে কে? খুকুটাও তো হচ্ছে তেমনি।'

'বাজে ওজর কোরো না,' মৃগাঙ্ক ডাক্তার বলে ওঠেন, 'বাজে ওজরের মত বিরক্তিকর জিনিস পৃথিবীতে অল্পই আছে, বুঝলে? কাল থেকে যখন ওকে খেতে দেবে, খুকুকে আটকে রাখবার ব্যবস্থা করবে। এই হচ্ছে আমার শেষ কথা। এটুকু যদি তোমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে আইন আমাকে নিজের হাতেই নিতে হবে।'

শেষ রায় দিয়ে ফের ঘরের মধ্যে ঢুকে যান মৃগাঙ্ক।

কিন্তু ইত্যবসরে আপ্রাণ চেষ্টায় মার কোল থেকে নেমে পড়েছে খুকু। আর আবার গিয়ে থাবা বসিয়েছে দাদা প্রস্তাবিত সেই ওর 'খল্লেতে'।

ঠাস করে মেয়েকে একটা চড় কসিয়ে আবার তাকে কোলে তুলে নিল অতসী, চাপা কড়া গলায় বলে উঠল, 'তোর শরীরে কি লজ্জা নেই হতভাগা ছেলে? তোর জন্যে যে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করে আমার। কেন তুই খাবার দিস ওকে? জানিস উনি বাচ্চাদের কারুর এঁটো খাওয়া ভালবাসেন না। তবু কেন? বল কেন?'

কেন ?

মার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে না সীতু, ইচ্ছে করেই দেবে না। উত্তর এর পরে দেবে কাজের মধ্য দিয়ে। যেই না খুকু পাজীটা সীতুর খাবারের উপর হাত বসাবে, মার চাইতেও বেশী জোরে ঠাস করে চড় বসিয়ে দেবে ওকে।

হ্যাঁ, দেবেই তো! নিশ্চয় দেবে।

সীতুকে যদি কেউ মায়া না করে, সীতুই বা করতে যাবে কেন ?

মায়া করতে যাবে কেন, ভাবতে গিয়েও মাটির উপর ঝরঝরিয়ে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ে, মাটির দিকে তাকানো চোখ দুটো থেকে।

খুকুর খ্যাঁদা নাকওলা লাল-লাল মুখটা আপাততঃ দেখতে না পেলেও তার মার খাওয়া মুখটা কল্পনা করে চোখের জল আটকাতে পারে না সীতু।

অতসী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'কিছুই তো খাওয়া হ'ল না। আমারই অন্যায়, ঠিক কথাই বটে, আমার অন্যায়। কিন্তু তুই-ই বা এমনি করিস কেন ? কেন আগে আগে খেয়ে নিতে পারিস না ঠাকুরের কাছে, মাধবের কাছে ? সেই আমাকে তুলে তবে ছাড়বি। আমি উঠে পড়লেই খুকু উঠে পড়ে দেখতে পাস না ?'

'না পাই না। আমি কিছু দেখতে পাই না।' বলে ছুটে পালিয়ে যায় সীতু। অতসী হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। হতাশ ? তাই কি ? আরও অন্য কেমন একরকম না ?

কিন্তু কেমন করে তাকিয়ে রইল অতসী ?

কি ছিল তার চোখের দৃষ্টিতে ? ছেলের উপর রাগ ? স্বামীর উপর বিরক্তি ? না, নিজের উপর ধিক্কার ? স্বামীকে হাতের মুঠোয় পুরতে পারে নি, পারেনি তার সমস্ত তীক্ষ্ণতা ক্ষইয়ে ভোঁতা করে ফেলতে, এই ধিক্কারেই কি মরমে মরে যাচ্ছে অতসী ?

কিন্তু তা কেন ?

সংসারের রাশভারী কর্তারা তো এমন অনেক বাড়াবাড়ি শাসন করেই থাকে, গৃহিণীরা হয় সেটা সভয়ে মেনে নিয়ে সাবধান হয়, নয়তো বিদ্রোহ করে চোট-পাট প্রতিবাদ জানায়। অতসীর মত এমন মর্মাহত কে হয় ?

ছেলেও তেমনি অদ্ভুত !

বাপের দিক মাড়ায় না। বাপের দিকে তাকায় যেন শত্রুর দৃষ্টিতে। বয়স্ক ছেলে নয়, মাত্র একটা আট বছরের ছেলে, তাকে নিয়ে অতসীর একি দুঃসহ সমস্যা !

সংসারে ভোগ্যবস্তু বলতে যা-কিছু বোঝায়, তার কোন কিছুরই অভাব নেই অতসীর। না, তা' বললেও বুঝি ঠিক হয় না। অভাব তো নেইই, বরং আছে অগাধ প্রাচুর্য।

বাড়ি-গাড়ি চাকর-বাকর আসবাব-উপকরণ সব কিছুই প্রয়োজনের অতিরিক্ত। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ স্বামী, সুকান্তি পুত্র, সোনার পুতুলের মত মেয়ে।

স্বামী মদ্যপ নয়, চরিত্রহীন নয়, অন্যাসক্ত নয়, স্ত্রীর প্রতি স্নেহহীন নয়। অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার তো সীমা নেই অতসীর। অগুনতি উপার্জন করেন মৃগাঙ্ক, অনায়াসে অবহেলায় এনে ফেলে দেন স্ত্রীর হাতে। কোনদিন প্রশ্ন করেন না—টাকাটা কোন্ খাতে খরচ করলে?

আর কী চাইবার থাকে মেয়েমানুষের?

স্বামীর স্বভাব রুক্ষ কঠোর—এ কথাই বা কি করে বল্‌বে অতসী? কত কোমল মন ছিল মৃগাঙ্কর। মৃগাঙ্কর মন কোমল না হলে অতসী কোন্ টিকিটের জোরে এই ঐশ্বর্যের সিংহাসনে এসে বসতো?

কি আছে অতসীর?

অগাধ রূপ? অনেক বিদ্যা? অসাধারণ বংশমর্যাদা?

কিছু না, কিছু না।

অতসী অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ। মৃগাঙ্কর প্রেমই অতসীকে মূল্যবান করেছে।

আশ্চর্য! তবু অতসী দুঃখী।

অতসীর আপন আত্মজ নষ্ট করে দিচ্ছে অতসীর সমস্ত সুখশান্তি।

কেন সীতুর পূর্বজন্মের স্মৃতি বিলুপ্ত হল না? ডাক্তার মৃগাঙ্ক এত রোগের চিকিৎসা করতে পারে, পারে না এ রোগের চিকিৎসা করতে?

কতদিন ভাবে অতসী, জিজ্ঞেস করবে মৃগাঙ্ককে। এমন কোন একটা ওষুধ-টষুধ খাইয়ে দেওয়া যায় না ওকে, যাতে ওই ঝাপসা-ঝাপসা স্মৃতির ছায়াটা একেবারে মুছে যায়।

বলতে পারে না।

মৃগাঙ্ক কি ভাববে?

যদি এই অদ্ভুত প্রস্তাবে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'কিন্তু অতসী তোমার? তোমার ব্যাপারটার কি হবে?'

তখন অতসী কি বলবে?

ছেলে আর ছেলের মাকে শাসন করে মৃগাঙ্ক ডাক্তার ফের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। সত্যি আজ তিনি বড় বেশী ক্লান্ত।

কিন্তু এও ঠিক—শুধু পরিশ্রমেই ক্লান্ত হচ্ছেন না ডাক্তার। সাংসারিক জীবনটাই দিনের পর দিন ক্লান্ত করে তুলেছে তাঁকে।

বেশ বেশী খানিকটা বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতই ছিলেন মৃগাঙ্ক। প্রচুর উপার্জন করেছেন, প্রচুর খরচ করেছেন, বন্ধু পোষণ করেছেন, আত্মীয়-কুটুম্বকে সাহায্য করেছেন, আর করেছেন বাড়ি, গাড়ি, আসবাবপত্র।

তারপর কোথা দিয়ে কি হ'ল, অতসী এল জীবনে। পালা বদলালো। অ'ণ্বিয়ের পর প্রথম দু' একটা বছর তো এক অপূর্ব সুখের ঘোরে কেটেছে, কিন্তু সেই ঘোরের সুর কেটে দিল সীতু। মা, আর বাপের মধ্যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর হয়ে উঠল সে. দু'জনের মনের সহজ আদান-প্রদানের দরজা বুঝি রুদ্ধ হয়ে গেল!

মৃগাঙ্কর মধ্যে বাড়তে লাগলো বিদ্বেষ, বিরক্তি, অশান্তি। অতসীর মধ্যে কাজ করতে লাগলো—হতাশা, অভিমান আর অপরাধবোধ!

তারপর এল খুকু।

আর খুকু আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৃগাঙ্ক সীতুকে একেবারে দূরে ঠেললেন।

সীতুর প্রতি বিদ্বেষ আর বিরক্তি তাঁর বেড়েই চলতে লাগলো, কারণে-অকারণে তার প্রকাশ্য অভিব্যক্তি অতসীকে মরমে মারতে লাগলো।

খানিকক্ষণ শুয়ে থেকে, উঠে পড়লেন মৃগাঙ্ক। ভাবলেন এ অবস্থার একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। নেপ্‌বাহাদুরকে ডেকে বললেন, 'খোকাবাবুকো বোলাও।'

প্রমাদ গণলো নেপ্‌বাহাদুর।

'ডাক্তার সাহাব বোলিয়েছে' বললেই তো খোকাবাবু বেঁকে বসবে। তবু সেকথা তো আর ডাক্তার সাহাবের মুখের উপর বলা যায় না। অগত্যাই ভারাক্রান্তচিত্তে গিয়ে খোকাবাবুর কাছে বক্তব্য পেশ করলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে তার আশঙ্কা অনুযায়ী উত্তর মিললো 'যাব না!'

তারপর চললো দু'জনের বাক্‌যুদ্ধ।

নেপ্‌বাহাদুরের বহু যুক্তিপূর্ণ বাছাই বাছাই বাণ, আর সীতুর সংক্ষিপ্ত এক-একটি তীক্ষ্ণ বাণ।

শেষ পর্যন্ত নেপ্‌বাহাদুরেরই জয় হলো, অবশ্য গায়ের জোরের জয়। যতই হোক আট বছরের ছেলে তো। ওর সঙ্গে পারবে কেন? পাঁজাকোলা করে নিয়ে এল সে।

'শোনো', গম্ভীরভাবে বললেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার, 'আমার প্রথম কথা হচ্ছে, কথার উত্তর দেবে। যা বলবো শুধু আমিই বলে যাব, আর তুমি বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় গুঁজে বসে থাকবে, তা চলবে না। শুনবে একথা?'

বলাবাহুল্য সীতু বুনো ঘোড়ার নীতিই অনুসরণ করে।

মৃগাঙ্ক একটু অপেক্ষা করে আরও গম্ভীরভাবে বলেন, 'খুকুকে এঁটো জিনিস খেতে দিতে বারণ করি, দাও কেন?'

হঠাৎ সীতুর নিজেকে আলাদা একটা লোক আর খুকুটাকে বাবার মেয়ে মনে হয়। তাই বুনো ঘাড়টা ঝট্ করে তুলে রুক্ষভাবে বলে, 'আমি সেধে সেধে দিতে যাই না, ও-ই হ্যাংলার মতন চাইতে আসে।'

মৃগাঙ্ক বিদ্রূপে মুখ বুঁচকে বলেন, 'ওর অনেক বুদ্ধি, ও একটা মাতব্বর, তাই ওর কথা ধরতে হবে, কেমন? হাজার বার বলিনি তোমায়, বড়দের এঁটো খেলে অসুখ করে ছোটদের?'

'আর যখন নেপ্‌বাহাদুরের খাওয়া ভুট্টার দানা খায়? তার বেলায় দোষ হয় না? যত দোষ নন্দ ঘোষ!'

মাথাটা ঝাঁকিয়ে অন্য দিকে তাকায় সীতু। বাপের ভয়ে নয়, বাপের দিকে তাকাবে না বলে।

মৃগাঙ্ক অসহ্য ক্রোধে মিনিট খানেক চুপ করে থেকে তিক্তস্বরে বলেন, 'হুঁ, অনেক কথা শেখা হয়েছে যে দেখছি। কেন, নেপ্‌বাহাদুরের কাছেই বা খায় কেন? তুমি যদি দেখতে পাও তো তুমি বারণ কর না কেন?'

বলা বাহুল্য সীতু নীরব।

মৃগাঙ্ক বুঝি ভুলে যান তাঁর সম্মুখবর্তী প্রতিপক্ষ একটা বালকমাত্র, ভুলে যান ওর সঙ্গে সমান সমান হয়ে কথা কইলে তাঁরই মর্যাদার হানি হবে, ওর কিছুই না। তাই সেই সমান সমান ভাবেই কথা বলেন, 'না, তুমি বারণ কর না। তার মানে হচ্ছে, তুমি চাও খুকুর ওই সব নোংরা খেয়ে অসুখ করুক। বল, তাই চাও কি না?'

'হ্যাঁ চাই-ই তো, খুব চাই।'

সহসা বিদ্যুতের বেগে উত্তর দেয় সীতু, বোধ করি কথার মানে না বুঝেই। বোধ করি শুধু বাবার মুখের উপর কথা বলার সুখে।

'তাই চাও? তাই চাও তুমি?' মৃগাঙ্কর গলা পর্দায় পর্দায় চড়ে, 'তা বলবে বৈ কি। তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। আমড়াগাছে আমড়া না ফলে কি আর ল্যাংড়া ফলবে? কিন্তু মনে রেখো, তোমার ওই সব বদমাইশী সহ্য করবো না আমি। ফের যদি ওরকম দেখি, উচিত শাস্তি দেব।'

'বেশ, খুকুও যেন আমার দিকে না আসে।'

কষ্টে চোখের জল চেপে উচ্চারণ করে সীতু এই ভয়ঙ্কর শর্তের বাক্য।

'ও বটে নাকি?' মৃগাঙ্ক সেই রকম ব্যঙ্গের হাসি হেসে ওঠেন। সে হাসিটা যেন সীতুর কানের পর্দাটা পুড়িয়ে দিয়ে, গায়ের চামড়াটা জ্বলিয়ে দিতে দিতে বাতাসে বিলীন হয়। 'বটে! এই সমস্ত বাড়িটা তা হলে একা তোমারই? তোমার এলাকায় ওর প্রবেশ নিষেধ?'

'হ্যাঁ তো। হ্যাংলা বেহায়াটা তো কাছে এলেই খেতে চাইবে।'

'কী! কী বললি?'

মৃগাঙ্ক গর্জন করে ওঠেন, 'বেয়াদপ অসভ্য ছেলে! দিন দিন গুণ প্রকাশ হচ্ছে। আর যদি কোনদিন এভাবে মুখে মুখে জবাব দিতে দেখি, চাবকে লাল করবো তোমায় আমি।'

এ গর্জন অতসীর কাছে পর্যন্ত পৌঁছয়।

উঠে এ ঘরে ছুটে আসতে যায়। আবার কি ভেবে থেমে পড়ে। দাঁতে ঠোঁট চেপে বসে থাকে নিজের ঘরে।

কিন্তু একটা বলবান স্বাস্থ্যবান কর্তা পুরুষের ক্রোধের গর্জন কি দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে বিলীন হয়ে যায়? দেয়াল ভেদ করে ফেলে না?

ক্ষীণ-কণ্ঠ একটা শিশুর বুকের পাটাটা যতই বেশী হোক, আর তার বিদ্বেষের তীব্রতাটা যতই প্রখর হোক, কণ্ঠস্বরটা ক্ষীণই থাকে। পর্দায় চড়ে শুধু একটা স্বরই, দুটো দেয়াল ভেদ করে এ ঘরে এসে আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে সে স্বর।

'এই জন্যেই বলে, কুকুরকে লাই দিতে নেই। তোমার এই আস্পদ্দার ওষুধ কি জানো? জলবিছুটি। আর এবার থেকে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। ছোঁবে না তুমি ওকে, বুঝলে? আঙুল দিয়েও ছোঁবে না। কী হল! আবার মুখের ওপর চোপা? হ্যাঁ তাই, শুধু তোমার হাতই লোনা। তোমার হাত গায়ে পড়লেই রোগা হয়ে যাবে খুকু। তাই ঠিক। উঃ! এক ফোঁটা ছেলে, আমার জীবন বিষ করে ফেলেছে একেবারে। এই জন্যেই শাস্ত্রে বলে বটে—আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ—'

না, ঘরে বসে থাকতে পারে না অতসী। ধীরে ধীরে ও ঘরে গিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'শাস্ত্রে কী বলে সেটা আর পাড়া জানিয়ে নাই বা বললে?'

মৃগাঙ্ক চট করে উত্তর দিতে পারেন না, কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন অতসীর দিকে। বুঝি এতক্ষণ যা-কিছু বলছিলেন উগ্র এক নেশার ঘোরে। এখন অতসীর এই মৃদু কণ্ঠের দৃঢ়তায় ফিরে পেলেন চৈতন্য। নিজের ব্যবহারের কদর্যতার দিকে তাকিয়ে অশ্রদ্ধা এল নিজের উপর, আর আরও রাগ বাড়লো ওই হতভাগা ছেলেটার উপর, যে নাকি এই সব কিছুর হেতু।

কিন্তু কটুকথা বলারও বুঝি একটা নেশা আছে। তাই মৃগাঙ্ক মনে মনে অপ্রতিভ হলেও মুখে বলে ওঠেন, 'ছেলের হয়ে ওকালতি করতে আসা হলো?'

'না, তোমার জন্যে এলাম। তোমাকে বাঁচাতে। এমন করে নিজেকে আর মেরোনা তুমি।' সীতুর দিকে তাকিয়ে আরও দৃঢ়কণ্ঠে বলে অতসী, 'যা, তুই ওঘরে যা। পড়গে যা।'

সীতু অবশ্য নড়ে না, তেমনি ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে।

'যা।' তীব্র চীৎকার করে অতসী।

তথাপি সীতু অনড়।

'যা বলছি। শুনতে পাচ্ছিস না?'

সীতু যথাপূর্বং।

'নিজে থেকে নড়বি না তা'হলে?'

আর ধৈর্য থাকে না। একটা কান ধরে টেনে ঘরের বার করে দেয় অতসী। দিয়ে এসে রাগে হাঁপাতে থাকে।

মৃগাঙ্ক একটুক্ষণ চেয়ে থেকে গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'বলতে পারতাম, তোমাকে কে বাঁচাতে আসবে অতসী? কিন্তু বললাম না।'

অতসীর চোখ দুটো জ্বালা করে আসে, তবু কষ্টে কঠিন হয়ে বলে, 'তুমি মহানুভব, তাই বললে না।'

মৃগাঙ্করও কি চোখ জ্বালা করছে?

তাই অন্য দিকে, খোলা জানলার দিকে তাকাচ্ছেন খোলা হাওয়ার আশায়।

সেই দিকে তাকিয়েই বলেন মৃগাঙ্ক, 'আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ক্রমশঃ এতেই দাঁড়াচ্ছে, না অতসী? আঘাত আর প্রতিঘাত!'

অতসী উত্তর দেয় না।

হয়তো দেবার ক্ষমতা থাকে না বলেই দেয় না। মৃগাঙ্কই আবার কথা বলেন, 'যদি আমার উপর এখনো একটু বিশ্বাস তোমার থাকে অতসী তো, বলছি বিশ্বাস কর, ওকে ধমক দেবার জন্যে ডাকিনি আমি, মিষ্টি কথায় বোঝাবার জন্যেই ডেকেছিলাম। কিন্তু—'

আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে মৃগাঙ্কর।

'কিন্তু কি, তা কি জানে না অতসী? সীতুর ঔদ্ধত্য, সীতুর একগুঁয়েমি বরফকেও তাতিয়ে তুলতে পারে, সে তো অতসীর হাড়ে হাড়ে জানা। তবু মৃগাঙ্ক যখন বিষতিক্ত স্বরে কটূকাটব্য করে সীতুকে, সীতুর দিকে তাকিয়ে যখন মৃগাঙ্কর চোখ দিয়ে শুধু ঘৃণা আর আগুন ঝরে, তখন আর মেজাজের ঠিক রাখতে পারে না অতসী। তখন তুচ্ছ সীতুর একগুঁয়েমি, ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতাগুলো তুচ্ছতার কোঠায় গিয়ে পড়ে, প্রকট হয়ে ওঠে মৃগাঙ্কর অভিব্যক্তিটাই।

'আমাদের ভালোবাসার মধ্যে ও যে এতবড় একটা ভীষণ প্রাচীর হয়ে উঠবে, এতো আমরা কখনো ভাবিনি অতসী?'

'ভাবলে কি করতে?' অতসী তীক্ষ্ণস্বরে বলে ওঠে, 'ওকে মুছে ফেলতে?'

'অতসী!'

বজ্রগম্ভীর দৃষ্টিতে অতসীর দিকে তাকান মৃগাঙ্ক, 'ওই দুর্মতি ছেলেটা তোমার মতিবুদ্ধি সব নষ্ট করে দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি, তোমার প্রভাব ওকে সুস্থ করে তুললো না, ওর প্রভাব তোমাকে নষ্ট করে ফেলতে বসলো।'

'আমি যা ছিলাম তাই-ই আছি,' সহসা ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে এতক্ষণকার রুদ্ধ আবেগ, 'তুমিই বদলাচ্ছো। দিন দিন বদলে যাচ্ছো।'

মৃগাঙ্ক আস্তে ওর কাঁধের উপর একটা হাত রাখেন, 'আমিও বদলাইনি অতসী! শুধু মাঝে মাঝে কেমন ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। হয়তো বেশী পরিশ্রমের ফল এটা, হয়তো বা বয়সের দোষ।'

অতসী মুখটা চেপে ধরে সেই বলিষ্ঠ হাতখানার আশ্রয়ের মধ্যে।

তখনকার মত সমস্যা মেটে।

কিন্তু সে মীমাংসা তো সাময়িক।

বড় একটা আলুর মত ফুলে উঠল ছোট্ট কপালের কোলটুকু। পড়ে গিয়ে ককিয়ে উঠে সেই যে থেমে গিয়েছিল খুকু, আবার স্বর ফুটলো অনেক কাণ্ড করে। ঠাণ্ডাজল, গরমজল, বাতাস, ধরে ঝাঁকানি, যত রকম প্রক্রিয়া আছে, সবগুলো করে দেখার পর আবার কেঁদে উঠল সে।

কিন্তু এমন করে পড়ল কি করে খুকু? এতগুলো চাকর-বাকরের চোখ এড়িয়ে?

না, চোখ এড়িয়ে কে বললো?

চোখের সামনে দিয়েই তো।

খুকুর নিজের দাদা যদি খুকুকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়, ওরা কি করবে? মাইনে-খেগো চাকররা?

সেই কথাই বলে ওঠে বামুন-মেয়ে—স্পষ্টবাদিতার গুণে যে সকলের চক্ষুশূল আবার ভীতিস্থল।

সারা সংসার মাথায় করে রাখে বলেই অতসীকেও বাধ্য হয়ে হজম করতে হয় বামুন-মেয়ের এই স্পষ্টবাদিতা। কাজেই বামুন-মেয়ে যখন খর খর করে বলে, 'তা ওরা কি করবে? এদের না-হক্ বকুনি দিচ্ছ কেন মা, ওরা মাইনে-খেগো চাকর, শুধু এই অপরাধে? তোমার নিজের ছেলেটি যে একটি খুনে, সে হিসেব তো শুনতে চাইছ না? এই তো আমার চোখের সামনেই তো—কচি বাচ্চাটা 'দাদ্দা দাদ্দা' করে গিয়ে যেই না হাঁটুটা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছে,—ওমা, ধরে তুমি আমায় জেলেই দাও আর ফাঁসীই দাও, সত্যি কথাই কইব,—বললে বিশ্বাস করবে না, ঝনাৎ করে হাঁটু আছড়ে ফেলে দিল বোনটাকে। আর লাগবি তো লাগ, ধাক্কা খেলো একেবারে টেবিলের পায়ার কোণে। ওমা, না বুঝে ঠেলেছিস, তাই নয় তুলে ধর? তা নয়, যেই না মেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো, সেই তোমার ছেলে উদ্ধশ্বাসে দৌড়ে হাওয়া! যাই বল মা, ছেলে তোমার হয় পাগল নয় সর্বনেশে ডাকাত!'

এ মন্তব্যের বিরুদ্ধে কি বলবে অতসী?

কি বলবার মুখ আছে?

খুকুটা যে মরে যায়নি এই ভগবানের অশেষ দয়া। ভাবতে গিয়ে প্রাণটা আনচান করে চোখে জল এসে পড়ে। মেয়েকে বুকে চেপে ধরে মনে মনে বলে, 'কত দয়া তোমার ঠাকুর, কত দয়া!'

খুকুর কোন বিপদ হলে অতসীর প্রাণটা যে ফেটে শতখান হয়ে যেত, একথা তত মনে পড়ছে না অতসীর, যতটা মনে পড়ছে, তাহলে অতসী মুখ দেখাত কি করে?

হে ভগবান! অতসীকে উদ্ধার করো, দয়া করো।

কিন্তু অপরাধীর আর পাত্তা নেই কেন? এদিক ওদিক খুঁজে এসে শেষ পর্যন্ত সেই চাকরবাকরদেরই প্রশ্ন করতে হয় 'খোকাবাবু কাঁহা হ্যায়?'

খোকাবাবু!

না, খোকাবাবুর খবর কেউ জানে না। খুকুর পড়ে যাওয়ার মত ভয়ঙ্কর মারাত্মক দৃশ্যটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কে আর খোকাবাবুর গতিবিধি দেখতে গেছে?

পাথরের মত মুখ করে মেয়ের কপালের পরিচর্যা করলেন মৃগাঙ্ক, নিঃশব্দে হাত ধুতে চলে গেলেন। অতসীও দাঁড়িয়ে রইল তেমনি নিঃশব্দে। বোঝা যাচ্ছে না, তার মুখে যে অন্ধকার ছায়াটা জমাট হয়ে আছে, সেটা অপরাধ-বোধের, না অভিমানের।

মৃগাঙ্ক ঘরে এসে বসতেই অতসী কাছে এসে দাঁড়াল। বললো, 'তুমি ওকে যা খুসি শাসন করো, আমি কিচ্ছু বলবো না।'

'শাসন করে কি হবে? একদিন শাসন করে কি হবে?'

অতসী বলে, 'এমন ভয়ঙ্কর একটা কিছু করো, যাতে চিরদিনের মত ভয় জন্মে যায়।'

'আমি তো পাগল নই!' মৃগাঙ্ক থমথমে গলায় বলেন।

'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, ও পাগল হয়ে যাচ্ছে কিনা।'

'ওই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দাও।'

'তবে আমি কি করবো বলে দাও।'

'করবার কিছু নেই। ধরে নিতে হবে এই আমাদের জীবন।'

অতসী কি একটা বলতে যায়, ঠোঁটটা কেঁপে ওঠে, বলা হয় না। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সীতুকে পাঁজাকোলা করে চেপে ধরে নিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়ায় বাড়ীর দরোয়ান শিউশরণ।

সীতু অবশ্য যথাসাধ্য হাত-পা ছুঁড়ছে, কিন্তু শিউশরণের সঙ্গে পারবে কেন? তাছাড়া তার একখানা হাত তো জোড়া আছে নিজের ভাঙাকপাল সংক্রান্ত ব্যাপারে।

হ্যাঁ, বাঁ হাতের চেটোটা কপালে চেপে ধরে বাকি তিনখানা হাত-পা এলোপাথাড়ি চালাচ্ছে সীতু।

সীতুর কপালে আবার কি হলো?

শিউশরণের বহুবিধ কথার মধ্যে থেকে আবিষ্কার করা যায়, কি হল।

নীচের তলায় নেমে গিয়ে বাড়ির পিছনের দেয়ালের গায়ে ঠাঁই-ঠাঁই করে নিজের কপালটা ঠুকছিল সীতু। নেহাত নাকি জমাদারটা এসে শিউশরণকে এই অস্বাভাবিক কাণ্ডের খবরটা দেয়, তাই কোন প্রকারে এই ক্ষ্যাপাকে ধরে আনতে সক্ষম হয়েছে সে।

শিউশরণ নামিয়ে দিতেই একেবারে স্থির হয়ে গেল সীতু। হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ করে দাঁড়াল দুখানা হাত দুদিকে ঝুলিয়ে, মুখ নীচু করে। তবু দেখা যাচ্ছে, সীতুর কপালটাও ফুলে

উঠেছে বড় একটা আলুর মত। বাড়তি আরও কিছু হয়েছে, সমস্ত কপালটা ছ্যাঁচা-ছ্যাঁচা কালশিরে কালশিরে।

হ্যাঁ, সীতুর কপালের পরিচর্যাও মৃগাঙ্ককেই করতে হল বৈ কি!

অতসী মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেলেও, এ ছাড়া আর কী সম্ভব?

কিন্তু মৃগাঙ্কর পাথুরে মুখটা একটু যেন শিথিল হয়ে গেছে, মুখের রেখাগুলো একটু যেন ঝুলে পড়েছে। বড় বেশী চিন্তিত দেখাচ্ছে যেন সে মুখ।

'এ রকম করলে কেন?'

সীতু যথারীতি গোঁজ হয়েই রইল।

মৃগাঙ্কর স্বরটা কোমল কোমল শোনায়, 'তোমার কপাল ফুলে উঠল বলে কি খুকুর কষ্টটা কমলো?'

'সেজন্যে নয়।' হঠাৎ একটা দৃপ্তস্বর ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'সে জন্যে নয়?' কোঁচকানো ভুরুর নীচে চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে মৃগাঙ্কর, 'তবে কি জন্যে?'

'ঠুকলে কি রকম লাগে তাই দেখতে।'

'তা' ভাল। বেশ ভালই লাগল—কেমন?' ক্ষুব্ধ একটু হেসে চলে গেলেন মৃগাঙ্ক।

সীতুকে কখনো তুমি ছাড়া তুই বলেন না মৃগাঙ্ক। এ এক আশ্চর্য রহস্য! অন্তত চাকর-মহলের কাছে।

দু'দুটো এত বড় অপরাধ করেও এমনি বা কি শাস্তি পেল সীতু?

রহস্য এখানেও।

শিউশরণের কাছে নেপ্‌বাহাদুর গিয়ে গল্প করে—কপালে ব্যাণ্ডেজবাঁধা ছেলে একা শুয়ে আছে—না মা; না বাপ। ওকে কেউ দেখতে পারে না।

শিউশরণ মন্তব্য করে, ও রকম ছেলেকে যে আছড়ে মেরে ফেলেন না সাহেব, এই ঢের। তাদের দেশে হলে ও ছেলেকে বাপ আস্ত রাখত না। সমালোচনা চলতেই থাকে নীচের তলায়। রোজই চলে।

অমন মা-বাপের ওই ছেলে!

মামাদের মতন হয়েছে বোধ হয়।

কিন্তু মামাই বা কোথা? এই চার-পাঁচ বছর রয়েছে তারা, কোনদিন দেখেনি সীতুর মামা বা মাতুলালয় বলে কিছু আছে।

হ্যাঁ, সাহেবের আত্মীয়-স্বজন এক-আধটা বরং কালে-কস্মিনে দেখেছে। কিন্তু মাইজীর? না।

অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছয় ওরা—খুব গরীবের মেয়ে বোধ হয় অতসী। তিনকুলে কেউ নেই ওর।

ওদের অনুমান ভুলও নয়।

সত্যিই কেউ কোথাও নেই অতসীর। শুধু মানুষের জোর নয়, ভিতরের জোরও বুঝি তেমন করে কোথাও কিছু নেই। তাই সে গৃহিণী হয়েও যেন আশ্রিতা। নিজের ক্ষেত্রটাকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে নিঃশব্দে থাকতে চায় সে এখানে। সংসারে বামুন-মেয়ের একাধিপত্য মেনে নেয় নীরবে। চাকর-বাকরকে বকতে পারে না।

মৃগাঙ্ক যতই তাকে অধিকারের সিংহাসনে বসাতে চান, সে অধিকার খাটাবার সাহস হয় না অতসীর।

কিন্তু সীতু যদি এমন না হতো?

তা'হলে কি সহজ হতে পারতো অতসী? সহজ অধিকারে গৃহিণীপণা আর স্বামী-সন্তানের সেবায় সম্পূর্ণ করে তুলতে পারতো নিজেকে?

সীতু যেমন অহরহ নিজেকে প্রশ্ন করে, 'সেটা কোথায়? সেটা কোথায়?' অতসীও তেমনি সহস্রবার নিজেকে ওই প্রশ্ন করেছে 'তাহলে কি সহজ হতে পারতাম? তাহলে কি স্বচ্ছন্দ হতে পারতাম? পারতাম স্বামীকে সুখী করতে, আর নিজে সুখী হতে? শুধু—সীতু যদি অমন না হতো?'

ঝাপসা ঝাপসা ছায়া ছায়া যে ছবিটা সীতুকে যখন তখন উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে, সে ছবিটা কি সত্যিই সীতুর পূর্বজন্মের? সীতু কি জাতিস্মর?

কিন্তু সীতু জাতিস্মর হলে অতসীকেও তো তাই-ই বলতে হয়। অতসীর মনের মধ্যেও যে সেই একটা পূর্বজন্মের ছবি আঁকা আছে। ঝাপসা হয়ে নয়, স্পষ্ট প্রখর হয়ে। সীতুর সেই পূর্বজন্মেও অতসীর ভূমিকা ছিল সীতুর মায়ের।

সংসারের অসংখ্য কাজের চাপে ছেলে সামলাবার সময় ছিল না অতসীর, তাই তাকে একটা উঁচু জানলার ধাপে বসিয়ে রেখে যেত, হয়তো বা হাতে একখানা বিস্কুট দিয়ে, কি কাছে চারটি মুড়কি ছড়িয়ে দিয়ে।

জানলা থেকে নামতে পারতো না সীতু, বসে থাকতো গলির পথটার দিকে চেয়ে, হয়তো বা এক সময় ঘুমে ঢুলতো।

খাটতে খাটতে এক একবার উঁকি মেরে দেখতে আসতো অতসী, ছেলেটা কোন অবস্থায় আছে। ঢুলছে দেখে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে হাতে টেনে নামিয়ে চৌকিতে শুইয়ে দিত।

মমতায় মন ভরে গেলেই বা ছেলে নিয়ে দু'দণ্ড বসে থাকবার সময় কোথা? পাশের ঘরে আর একটা লোক পড়ে আছে আরো অসহায় শিশুর মত। সীতু তবু দাঁড়াতে পারে, 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করতেও শিখছে। আর সে লোকটা পৃথিবীর মাটিতে পা ফেলে হাঁটার পালা চুকিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার দিন গুনছে।

কিন্তু শিশুর মত অসহায় বলে তো আর সে শিশুর মত নিরুপায় নয়? তার মেজাজ আছে, গলার জোর আছে, অধিকারের তেজ আছে, আর আছে কটূক্তির অক্ষয় তূণ। তাই তার কাছেই বসে থাকতে হয় অতসীকে অবসরকালটুকু, তার জন্যেই খাটতে হয় উদয়াস্ত।

কিন্তু সে খাটুনির শেষ হলো কেমন করে?

সীতুর আর অতসীর সেই পূর্বজন্মটা কবে শেষ হলো? কোন্ অনন্ত পথ পার হয়ে আর এক জন্মে এসে পৌঁছল তারা?

জন্মান্তরের মাঝখানে একটা মৃত্যুর ব্যবধান থাকে না? থাকতেই হয় যে!

তা' ছিলও তো!

যাদের জন্মান্তর ঘটলো তাদের? না আর একটা মানুষের মৃত্যুর মূল্যে নতুন জীবনটাকে কিনল তারা?

জন্মান্তর! তা সত্যিই বৈকি।

নতুন জীবন! গলিত কীটদষ্ট জীর্ণ একটা জীবনের খোলস ছেড়ে হৃদয়-উত্তাপের তাপে ভরা তাজা একটা জীবন!

তবু কেন সীতু জাতিস্মর হলো?

কেন সে পূর্বজন্মের স্মৃতির ধূসর ছায়াখানাকে টেনে এনে এনে এই নতুন জীবনটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে তুললো?

কেন সে ছায়ায় তিনটে মানুষের জীবনের সমস্ত আলো ঢেকে দিতে সুরু করলো?

আচ্ছা, ওদের সেই পূর্বজীবনে মৃগাঙ্ক ডাক্তারও ছিলেন না?

—কী তাঁর ভূমিকা ছিল? শুধু ডাক্তারের?

ভাবতে গিয়ে ভাবতে ভুলে যায় অতসী।

মনে পড়ে না, ডাক্তারের ভূমিকাটা গৌণ হয়ে গিয়ে হৃদয়বান বন্ধুর ভূমিকাটায় কবে উত্তীর্ণ হলো মৃগাঙ্ক।

তবু!

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে অতসীর, ওই তবুটা ভাবতে গেলেই। কিছুতেই শেষ পর্যন্ত ভাবতে পারে না। ভেবে ঠিক করতে পারে না, যে লোকটা মারা গেল, সে বিনা পয়সার চিকিৎসা উপভোগ করতে করতে শুধু পরমায়ু ফুরোলো বলেই মারা গেল, না পরমায়ু থাকতেও বিনা চিকিৎসায় মারা গেল?

অদ্ভুত এই চিন্তাটার জন্যে নিজের কাছেই নিজে লজ্জায় মাথা হেঁট করে অতসী। বারবার বলতে থাকে 'আমি মহাপাপী।' তবু চিন্তাটা থেকে যায়।

কিন্তু শুধু আত্মনিন্দা করলেই কি জগতের সব সমস্যার মীমাংসা হয়? সমগ্র মানব সমাজ কি আত্মনিন্দায় পশ্চাৎপদ? সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তো মানুষ আত্মনিন্দায় পঞ্চমুখ হতে শিখেছে।

তবু মীমাংসা হয়নি।

তবু সংশোধন হয়নি মানুষের।

সংশোধনের হাতই বা কোথায়?

নিজেই তো মানুষ নিজের কাছে বেহাত। জন্মের আগে না কি তার বুদ্ধি আর চিন্তার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে থাকে পূর্বজীবনের সংস্কার। আর জন্মের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে থাকে নতুন জীবনের পূর্বপুরুষদের সংস্কার। অস্থিতে মজ্জাতে, শিরায় শোনিতে, স্তরে স্তরে সঞ্চিত হতে থাকে শুধু মা-বাপের নয়, তিন কুলের দোষ গুণ, মেজাজ, প্রবৃত্তি।

আকৃতি প্রকৃতি দুটোই মানুষের হাতের বাইরে। কেউ যদি ভাবে আপন প্রকৃতিকে আপনি গড়া যায়, সে সেটা ভুল ভাবে। ইচ্ছে থাকলেও গড়া যায় না। বড় জোর কুশ্রীতাকে কিঞ্চিৎ চাপা দেওয়া যায়, রুক্ষতাকে কিঞ্চিৎ মসৃণ করা যায়।

এর বেশী কিছু না।

শিক্ষাদীক্ষা সবই এখানে পরাজিত। শিক্ষাদীক্ষা বড় জোর একটু পালিশ লাগাতে পারে মানুষের আদিমতার উপর। যার জোরে চালিয়ে যায় মানুষ।

শিশুরা সভ্য, শিশুরা অশিক্ষিত, অদীক্ষিত। তাই শিশুরা বন্য, বর্বর, আদিম।

কিন্তু সীতুর কি এখনো সে শৈশব কাটেনি? সামান্যতম পালিশ পড়বার বয়স কি তার হয়নি।

সে কেন এমন বর্বরতা করে?

অতসী যদি তাকে সুশিক্ষা দিতে যায়, অতসীর চোখের সামনে দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে সীতু নির্ভয়ে বুকটান করে।

অতসী যদি গায়ের জোরে শাসন করতে যায়, সীতু তাকে আঁচড়ে কামড়ে মেরে বিধ্বস্ত করে দেয়।

অতসী যদি অভিমান করে কথা বন্ধ করে, সীতু অক্লেশে সাতদিন মার সঙ্গে কথা না কয়ে থাকে, নিতান্ত প্রয়োজনেও 'মা' বলে ডাকে না।

কোন্ উপায়ে তবে ছেলেকে শোধরাবে অতসী

অথচ নিরুপায়ের ভূমিকা নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে যেতেও তো পারে না। মৃগাঙ্কর যন্ত্রণাটা কি উপেক্ষা করবার?

তাই আবারও ছেলের কাছে গিয়ে বসে। আবারও সহজ সুরে বলতে চেষ্টা করে—'আচ্ছা সীতু, মাঝে মাঝে তোকে কিসে পায় বল্‌তো? ভূতে না ব্রহ্মদৈত্যে?'

'খুকুকে কেন ফেলে দিয়েছিলি?'

জিজ্ঞেস করেছিল অতসী. খুকুর ফুলো কপাল সমতল হয়ে যাবার পর। সীতুর তখনো প্রখর হয়ে রয়েছে ললাট লেখা।

একবারে উত্তর দেওয়া সীতুর কোষ্ঠিতে নেই, তাই আবারও ওই একই প্রশ্ন করে অতসী। বলে, 'বকবো না, মারবো না, কিছু শাসন করবো না, শুধু বল ফেলে দিলি কেন? তুই তো ওকে কত ভালবাসিস!'

খুকু প্রসঙ্গে চোখে জল এসে গেল সীতুর. তবু জোর করে বললো, 'পাজীটা আমার কাছে আসে কেন? আমার গায়ে হাত দেয় কেন?'

'ওমা, তা দিলেই বা—' অবোধ অজ্ঞান অকপট সরল অতসী, বিস্ময়ের গুঁড়ো মুখে-চোখে মেখে বলে, 'তুই দাদা হ'স তোকে ভালবাসবে না?'

'না, বাসবে না। আমার হাত তো লোনা। আমি গায়ে হাত দিলেই তো রোগা হয়ে যাবে ও, অসুখ করবে!'

'ছি ছি সীতু, এই তুই ভেবে বসে আছিস? ওমা, কি বোকারে তুই! সব বড়দেরই হাত ওই রকম। বাচ্চারা তো ফুলের মতন, একটুতেই ওদের অসুখ করে, তাই তো সাবধান হন তোর বাবা।'

'আমিও তো সাবধান হয়েছি। ঠেলে দিয়েছি।'

'আর তারপর নিজের কপাল দেয়ালে ঠুকে ঠুকে ছেঁচেছিস! তোকে নিয়ে যে আমি কি করবো! ওঁকে তুই অমন করিস কেন? উনি কি অন্যায় কিছু বলেন?' অতসী দম নেয়, 'কত বাড়ির কর্তারা কত রাগী হয়, কত চেঁচামেচি বকাবকি করে, দেখিসনি তো তুই, তাই একটুতেই অমন করিস। তুই যদি ওঁকে একটু মেনে চলিস, তাহলে তো কিছুই হয় না। বল, এবার থেকে ওঁর কথা শুনবি? যা বলবেন তাতেই বিশ্রীপনা করবি না? উনি তোর কি করেছেন? এই যে খুকুকে নিয়ে কাণ্ডটা করলি, কিচ্ছু বকলেন উনি তোকে? বল, বল সত্যি কথাটা।'

সীতু মাথা ঝাঁকিয়ে সত্যি কথাটাই বলে, 'না বকলেও ওঁকে আমার ছাই লাগে।'

'বেশ, তাহলে এবার থেকে খুব কসে বকতেই বলবো!'

আট বছরের একটা ছেলের কাছে নীচুর চরম হয় অতসী, হেসে ওঠে কথার সঙ্গে। হেসে হেসে বলে, 'বলবো সীতুবাবু বকুনি খেতেই ভালবাসে, ওকে খুব বকো এবার থেকে।'

আর সীতু? সীতু কঠিন গলায় বলে ওঠে, 'তোমার কথা আমার বিচ্ছিরি লাগছে।'

তবু হাল ছাড়ে না অতসী। তবু বলে, 'সীতুরে, তোর কি উপায় হবে? নরকেও যে জায়গা হবে না তোর! যে ছেলে মা-বাপকে এরকম করে, তাকে কি বলে জানিস? মহাপাপী! শেষটায় কিনা মহাপাপী হতে ইচ্ছে তোর?'

একটু বুঝি সঙ্কুচিত হয় ছেলে, পাপের ভয়ে, নরকের ভয়ে। অতসী সুযোগ বুঝে বলে, 'দেখছিস তো ওঁর চব্বিশ ঘণ্টা কত খাটুনি! দিনরাত খাটছেন। কেন? টাকা রোজগারের জন্যেই তো? কিন্তু সে টাকা কাদের জন্যে খরচ করছেন উনি? এই আমাদের জন্যে কি না? সেই মানুষকে যদি তুমি কষ্ট দাও, গুরুজন বলে একটুও না মানো, তা হলে মহাপাপী ছাড়া আর কি বলবে তোমাকে লোকে?'

না, সঙ্কুচিত হবার ছেলে নয় সীতু।

কথাগুলো যেন বেনা বনে মুক্তো ছড়ানোর মতই হয়। যার উদ্দেশে এত কথা, সে কথাটি পর্যন্ত কয় না, মুখখানা কাঠ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

তথাপি অতসী ভাবে একটু বোধ হয় নরম হচ্ছে। যে মনটা মাত্র সাড়ে আটটা বছর পৃথিবীর রোদ জল আলো অন্ধকারের উপসত্ব ভোগ করে সবে শক্ত হতে সুরু করেছে, তাকে আর অতগুলো শক্ত কথায় নরম করতে পারা যাবে না? অতএব আরও এক চাল চালে সে। বলে, 'ভেবে দেখ দিকিন, তোর জন্যে আমি সুদ্ধু কত বকুনি খাই! এবার প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনো ওঁর অবাধ্য হবি না। উনি যা বলবেন—'

'না প্রতিজ্ঞা করবো না।'

'না প্রতিজ্ঞা করবি না? এত বড় সাহস তোর?' অতসী ক্ষেপে ওঠে হঠাৎ। ক্ষেপে গিয়ে কোনদিন যা না করে, তাই করে বসে। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ছেলের গালে।

দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'অসভ্য জানোয়ার বেইমান!'

সমস্ত মুখটা লাল হয়ে ওঠে সীতুর, এ গালের রক্তিমাভা ও গালে ছড়িয়ে পড়ে। তবু উত্তর দেয় না সে। গালে হাতটাও বুলোয় না। এক ঝটকায় মার কাছ থেকে সরে গিয়ে বুনো জানোয়ারের মতই ঘাড় গুঁজে গোঁ গোঁ করে চলে যায়।

অতসী চুপ্ করে চেয়ে থাকে।

মনের মধ্যে মৃগাঙ্কর একদিনের একটা কথা বাজে, 'একটা বাচ্চা ছেলের কাছে আমরা হেরে গেলাম!' আক্ষেপ করে বলেছিলেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার।

হার মানবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল অতসী, ভেবেছিল সমস্ত চেষ্টা দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করে, সীতুকে নরম করবে। মানুষের আদিম কৌশল 'পাপের ভয়' দেখানো, তাও করে দেখবে। ছোট ছেলের মন, নিশ্চয়ই বিচলিত হবে মানুষের চিরকালীন নিয়ন্তা 'নরকের ভয়ের' কাছে।

কিন্তু প্রথম চেষ্টাতেই ব্যর্থতা ক্ষেপিয়ে তুললো অতসীকে। তাই মেরে বসলো সীতুকে।

এবার কি তবে মারের পথই ধরতে হবে? নইলে মৃগাঙ্ককে কি করে মুখ দেখাবে অতসী?

মৃগাঙ্ক ডাক্তারের বাড়িতে ফালতু কোনও আত্মীয় নেই, সবই মাইনে করা লোক। 'বামুন-মেয়ে'কে তো অতসীই এনে রেখেছে। তবু অতসীর উপর টেক্কা মারে ওরা—কাজে, কথায়।

বিশেষ করে বামুন-মেয়ে।

সে ছুটে আসে অতসীর এই নীরবতার মাঝখানে। বলে, 'ঠিক করেছেন মা, মারধোর না করে কি ছেলে মানুষ করা যায়? যে দেবতার যে মন্তর। আমি তো কেবলই ভাবি এমন একবগ্‌গা জেদি গোঁয়ার ছেলেকে কি করে বৌমা না মেরে থাকে? আপনি রাগই করুন আর ঝালই করুন মা, পষ্ট কথা বলবো, এমন ছেলে আমি জন্মে দেখিনি। বাপ বলে কথা, জন্মদাতা পিতা, তাকে কি অগ্যেরাহ্যি! সেদিনকে দেখি বারান্দায় টবে একটা গাছ পুঁতছে ছেলে, কে জানে কি এতটুকু গাছ। বাবু এসে বললেন 'কি হচ্ছে? বাগান?' বকে নয়, ধমকে নয়, বরং একটু হেসে, ওমা বলবো কি, বাপের কথার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে গাছটাকে উপড়ে তুলে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল। আমি তো অবাক! ধন্যি বলি বাবুর সহ্যশক্তি, একটি কথা বললেন না, চলে গেলেন। আমাদের ঘরে হলে বাপ অমন ছেলেকে ধরে আছাড় মারতো। শুধু কি ওই একটা? উঠতে বসতে তো বাপকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্যি। শাস্তরে বলেছে, পিতা সগ্‌গো পিতা ধম্‌মো, সেই পিতাকে এত অমান্যি?'

'বামুন-মেয়ে, তুমি তোমার কাজে যাও।'

গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দেয় অতসী। অসহ্য লাগছে ওর স্পর্ধা।

বামুন-মেয়ে হঠাৎ আদেশে থতমত খেয়ে চলে যায়। কিন্তু অতসী নড়তে পারে না, স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

ওর এসব কথার অর্থ কি?

এত কথা কেন?

একি শুধুই বেশী কথা বলার অভ্যাস? না আর কিছু?

গালটা জ্বালা করলেও গালে হাত দেবে না সীতু, কাঠ হয়ে বসে থাকবে সেই ওর জানলার ধারে, সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে।

এতো শুধু একটা চড় নয়, এ বুঝি সীতুর ভবিষ্যতের চেহারার আভাস।

তাহলে অতসীও এবার শাসনের পথ ধরবে। মৃগাঙ্ক ডাক্তারের মন রাখতে তার অনুকরণ করবে। বাপের উপর রাগ ছিল, মায়ের উপর আসছে ঘৃণা। ঘৃণা আসছে ওই বিশ্রী লোকটাকে মা ভয় করে বলে, ভালবাসে বলে।

সীতুর বয়েস কি মাত্র সাড়ে আট?

এত কথা তবে শিখলো কি করে সীতু? কে শেখালো এত প্রখর পাকামি?

এই প্যাঁচালো পাকা বুদ্ধিটা কি তা'হলে সীতুর পূর্বজন্মার্জিত?

কে জানে কি!

সীতু তার ছোট্ট দেহের মধ্যে একটা পরিণত মনকে পুষতে যন্ত্রণাও তো কম পায় না?

আচ্ছা, তবে কি এবার থেকে বাবাকে ভয় করবে সীতু? করবে ভক্তি? মার মত ভালও বাসবে—ভাববে বাবা কত কষ্ট করছেন তাদের জন্যে?

চিন্তার মধ্যেই মন বিদ্রোহ করে ওঠে।

বাবাকে সীতু কিছুতেই ভালবাসতে পারবে না, কক্‌খনো না। তার জন্যে মায়ের কাছে মার খেতে হলেও না।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর বোধকরি জলতেষ্টা পাওয়ায় উঠল সীতু। উঠে দেখল, সামনেই বারান্দার রেলিঙের তারে বাবার রুমাল দুটো শুকোচ্ছে ক্লীপ আঁটা। বোধহয় মাধব তাড়াতাড়ির দরকারে এখানে শুকোতে দিয়ে গেছে, এইখানটায় একটু রোদ এসে পড়েছে।

রুমাল দুটো ঝুলছে, বাতাসে উড়ছে ফরফর করে, সীতু সেদিকে একটু তাকিয়েই দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে পা উঁচু করে হাত বাড়িয়ে আটাকানো ক্লীপ্‌টা টেনে খুলে নেয়, আর মুহূর্তের মধ্যেই রুমাল দুটো কোথায় ছুটে চলে যায় রাস্তার ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে।

ওটা সম্পূর্ণ চোখ ছাড়া হয়ে গেলে সীতুর মুখে ফুটে ওঠে একটা ক্রুর হাসি। দরকারের সময় রুমাল না পেলে বাবা কি রকম রাগ করে সীতুর জানা। লোকসানটা যতই তুচ্ছ হোক, বাবার অসুবিধে তো হবে!

অতসী দূর থেকে তাকিয়ে দেখে আড়ষ্ট হয়ে চেয়ে থাকে, ছুটে এসে বকবে এমন সামর্থ্য খুঁজে পায় না মনের মধ্যে।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে গিয়ে আলমারি থেকে দু'খানা ফরসা রুমাল বার করে রেখে দেয় মৃগাঙ্কর দরকারী জায়গায়।

গালের জ্বালাটা যেন একটুখানি জুড়োল। আবার যেন চারিদিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে সীতুর। ঠিক হয়েছে, এই একটা উপায় আবিষ্কার করতে পেরেছে সীতু বাবাকে জব্দ করবার। সব সময় সীতুর দিকে কড়া কড়া করে তাকানো, আর ভারি ভারি গলায় বকার শোধ তুলবে সে এবার বাবাকে উৎখাত করে।

আর খুকুটাকে কেবল পাতের খাওয়াবে।

বাবা জব্দ হচ্ছেন এটা ভেবে ভারি মজা লাগে সীতুর। উপায় উদ্ভাবন করতে হবে জব্দ করার।

মোজার তলাটা রক্তে ভেসে গেল।

মোজা ভেদ করে কাঁচের কুচিটা পায়ের চামড়ায় বিঁধে বসেছে। হীরের মত ঝক্‌ঝকে ছোট্ট কোনাচে একটা কুচি।

'বাড়ীতে কী হচ্ছে কি আজকাল?' মৃগাঙ্ক ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠেন, রুগী দেখতে বেরোবার মুখে নিজেই রুগী হয়ে। 'মাধো! নেপ্‌বাহাদুর!'

ছুটে এল ওরা, আর সাহেবের দুরবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পা থেকে কাঁচের কুচিটা টেনে বার করছেন মৃগাঙ্ক মোজা খুলে, রক্তে ছড়াছড়ি যাচ্ছে জায়গাটা।

এইমাত্র জুতো পালিশ করে ঠিক জায়গায় রেখে গেছে মাধব, এর মধ্যে জুতোর মধ্যে কাঁচের টুকরো এল কি করে?

অতসীও এসে অবাক হয়ে যায়, 'কি করে? কি করে?'

'কি করে আর!' মৃগাঙ্ক তীব্র চীৎকার করে ওঠেন, জুতোর পালিশের বাহার করা হয়েছে, ঠুকে একটু ঝাড়া হয় নি। তুমি শীগগির একটু বোরিক কটন আর ডেটল দাও দিকি। আর এই মেধোটার এমাসে কদিন কাজ হয়েছে হিসেব করে মিটিয়ে বিদেয় করে দাও।'

মেধো অবশ্য কাঁচুমাচু মুখে প্রতিবাদ করে বোঝাতে থাকে, অন্তত চারবার সে জুতো ঠুকে ঠুকে ঝেড়েছে, কাঁচের কুচি তো দূরের কথা একদানা বালিও থাকার কথা নয়। কিন্তু মেধোর প্রতিবাদে কে কান দেয়?

মৃগাঙ্ক ডাক্তারের সহ্যশক্তি অগাধ হলেও, এত অগাধ নয় যে, চাকরের এতটা অসাবধানতার উপর এতখানি ধৃষ্টতা সহ্য করবেন। তাঁর শেষ কথা 'আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাক্ ও!'

ডাক্তারের নিজের চিকিৎসা করার সময় নেই। তখুনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করে ফের জুতোয় পা গলাতে হয় তাঁকে, মেধো সিঁড়ির কোণে বসে কাঁদছে দেখেও মন নরম হয় না তাঁর।

'ফিরে এসে যেন তোমাকে দেখি না' বলে চলে যান।

বলনে যতটা জোর ফুটলো মৃগাঙ্কর, চলনে ততটা নয়, পাটা রীতিমত জখম হয়েছে।

কিন্তু কোথা থেকে এল এই তীক্ষ্ণ কোনাচে কাঁচ কুচি? মাধবের চোখে 'অন্নওঠা'র অশ্রুধারা, অন্যান্যদের চোখে বিস্ময়ের ভীতি, অতসীর চোখে শঙ্কার ধূসর মেঘ।

শুধু অন্তরাল থেকে ছোট একজোড়া চোখ সাফল্যের আনন্দে জলজল করে। ছোট চোখ, ছোট বুদ্ধি, সামান্য অভিজ্ঞতা, তবু ডাক্তারের বাড়ির বাতাসে বুঝি এসব অভিজ্ঞতার বীজ ছড়ানো থাকে।

কাঁচের কুচি ফুটে থাকলে যে বিষাক্ত হয়ে পা ফুলে উঠে বিপদ ডেকে আনতে পারে, একথা এ বাড়ির বাচ্চা ছেলেটাও জানে।

'টেবিলের ওপর একখানা জার্নাল ছিল, কোথায় গেল অতসী ?'

রাত্রে অনেক রাত অবধি পড়াশোনা করেন ডাক্তার, করেন শোবার ঘরেই, টেবিল ল্যাম্পের আলোয়। আগে নীচতলায় লাইব্রেরী ঘরে পড়তেন, খুকুটা হওয়ার পর থেকে উঠে আসেন উপরে। খুকুর জন্যে নয়, খুকুর মার জন্যেই।

মেয়ে জন্মাবার পর অনেকদিন ধরে নানা জটিল অসুখের মধ্যে কাটাতে হয়েছে অতসীকে। তখন মৃগাঙ্ক অনেকটা সময় কাছে না থাকলে চলত না।

সেই থেকে রয়ে গেছে অভ্যাসটা।

শুতে এসে তাই এই প্রশ্ন।

অতসী বিমূঢ়ের মত এদিক ওদিক তাকায়, ঘরের টেবিল থেকে কোন কিছুই তো নড়ানো হয়নি।

'কি হলো সেটা ? তাতে যে ভীষণ দরকারী একটা আর্টিকেল রয়েছে, আজ রাত্রেই পড়ে রাখবো ঠিক করেছি। খোঁজ খোঁজ !'

কিন্তু কোথায় খুঁজবে অতসী ?

অতসীর ঘরটা তো ঘুঁটে-কয়লার ঘর নয় ! চাল-ডাল-মশলার ভাঁড়ার নয় যে, কিসের তলায় ঢুকে গেছে, হারিয়ে গেছে। বেশ মনোরম ছিম্‌ছাম্ ফিটফাট ঘর, সুতোটি এদিক ওদিক হয় না।

খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথাও না।

স্বামীর বিশেষ বিরক্ত হয়ে শুয়ে পড়ার পরও খুঁজতে থাকে অতসী। কিছু পড়াশোনা না করে মৃগাঙ্কর এরকম শুয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক।

অবশেষে মৃগাঙ্করই দয়া হল। কাছে ডাকলেন অতসীকে। কোমল স্বরে বললেন, 'আর বৃথা কষ্ট কোরো না, এসো শুয়ে পড়ো। এখুনি তো আবার খুকু জেগে উঠে জ্বালাতন করবে !'

মা-বাপে বিয়ে দেওয়া, অবলীলায় পাওয়া স্বামী নয়, মৃগাঙ্ক অতসীর ভালবেসে পাওয়া স্বামী। বয়সে অনেকটা তফাৎ হওয়া সত্ত্বেও প্রাণভরে ভালবেসেছিল অতসী মৃগাঙ্ককে, শ্রদ্ধা করেছিল ত্রাণকর্তার মত, ভক্তি করেছিল দেবতার মত।

আর মৃগাঙ্ক ?

মৃগাঙ্কও তো কম ভালবাসেননি, কম করুণা করেননি, কম স্নেহ-সমাদর করেননি।

তবু কেন ভয় ঘোচে না অতসীর ? তবু কেন মৃগাঙ্ক একটু কাছে টেনে কোমল স্বরে কথা বললেই চোখে জল আসে তার ?

মা-বাপে বিয়ে দেওয়া, অবলীলায় পাওয়া স্বামীর জন্যে বুঝি মনের মধ্যে এমন দায় থাকে না, থাকে না এমন 'হারাই হারাই' ভাব। সেখানে অনেক পেলেও পাওয়ার মধ্যে কৃতজ্ঞতা-বোধ রাখতে হয় না, মনকে দিয়ে বলাতে হয় না, 'তুমি কত দিচ্ছ ! তুমি কত মহৎ !'

প্রাপ্য পাওনায় আবার কৃতজ্ঞতা কিসের? অনায়াসলব্ধ জমার খাতায় টিঁকিয়ে রাখবার জন্যে আবার আয়াস কিসের?

যেখানে আমিই দাতা, 'আমি দান করছি আমাকে, সমর্পণ করছি আমাকে, উপহার দিচ্ছি আমার 'আমি'টাকে'—সেখানে অনন্ত দায়!

যে আমিকে উপহার দিচ্ছি, সমর্পণ করছি, দান করছি সে 'আমি'কে তো উপহারের যোগ্য সুন্দর করে তুলতে হবে? সমর্পণের যোগ্য নিখুঁত করে সম্পূর্ণতা দিতে হবে? দানের উপযুক্ত মূল্যবান করে গড়তে হবে?

তাই বুঝি সদাই ভয়! তাই বুঝি সব সময় কৃতজ্ঞতা!

'কি হল? কাঁদছ নাকি? কি আশ্চর্য!'

অতসী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলে, 'তোমার কত অসুবিধে হল! আমার অসাবধানেই তো—'

'আমার অসাবধানেও হতে পারে। আমিই হয়তো আর কোথাও রেখেছি। মিছে নিজেকে দোষী ভাবছো কেন? এটা তোমার একটা মানসিক রোগের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি।'

অতসী কি উত্তর দেবে?

'ঘুমিয়ে পড, মন খারাপ কোরো না। তোমার মুখে হাসি দেখবার জন্যেই আমি—কিন্তু রাহুমুক্ত পূর্ণশশী ক'দিনই বা দেখতে পেলাম!'

নিশ্বাস ফেলেন ডাক্তার।

অতসীও নিশ্বাস ফেলে ভাবে, সত্যি ক'দিনই বা? প্রথমটায় তো অদ্ভুত একটা ভয়, অপরিসীম একটা লজ্জা, আর অনেকখানি আড়ষ্টতা।

মৃগাঙ্কর আত্মীয় সমাজ আছে, নিজের পরিত্যক্ত জীবনেতিহাসের গ্লানিকর স্মৃতি আছে, চির অসন্তুষ্টচিত্ত বেয়াড়া আব্‌দেরে সীতু আছে। এ আড়ষ্টতা ঘুচতে সময় লেগেছে। তারপর এল খুকুর সম্ভাবনা। এল আনন্দের জোয়ার, নতুন করে নব মাতৃত্বের সূচনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল অতসী, উঠলো উচ্ছল হয়ে। কৃতজ্ঞতাবোধের দৈন্যটাও বুঝি গিয়েছিল, মূল্যবোধ এসেছিল নিজের উপর।

তাই বুঝি নারী মাতৃত্বে মনোহর!

সেই গৌরবে রমণী আর শুধু রমণী নয়, রমণীয়। তার প্রতি অণুপরমাণুতে ফুটে ওঠে সেই গৌরবের দীপ্তি। যে দীপ্তি বলে 'শুধু তুমিই আমায় অন্ন আর আশ্রয় দাওনি, আমিও তোমায় দিলাম সন্তান আর সার্থকতা!'

হয়তো সেই গৌরবের আনন্দে ক্রমশঃ সহজ হয়ে উঠতে পারত অতসী। কিন্তু সীতু বুঝি

পণ করেছে অতসীকে সহজ হতে দেবে না, সুখী হতে দেবে না। ওদের বংশধারাতেই বুঝি আছে এই হিংসুটেমি।

হ্যাঁ আছেই তো। তিন পুরুষ ধরে এই হিংসুটেপনা করে ওরা জ্বালাচ্ছে অতসীকে।

সেবার তো অতসীর নিজের ভূমিকা ছিল না কোথাও কোনখানে।

সে তো অনায়াসলব্ধ। মা-বাপের ঘটিয়ে দেওয়া বিয়ে। ছাঁদনাতলায় প্রথম শুভদৃষ্টি।

শুভদৃষ্টি!

তা তখন তো তাই ভেবেছিল অতসী। সেই দৃষ্টির সময় সমস্তখানি মন একটি শুভলগ্নের আশায় কম্পিত আবেগে থরথর করে উঠেছিল।

কিন্তু সে শুভলগ্ন তেমন করে প্রত্যাশার মুহূর্তে এসে দেখা দিল না। দিতে দিলেন না শ্বশুর। স্বার্থপর বৃদ্ধ, আপন সন্তানের আনন্দ আহ্লাদ সহ্য করবার ক্ষমতাও নেই তাঁর।

নইলে সত্যিই কি সে রাতে হার্টের যন্ত্রণায় মরমর হয়ে পড়েছিলেন তিনি? যে রাতে অতসীর জন্যে এ ঘরে ফুলের বিছানা পাতা হয়েছিল?

অতসী বিশ্বাস করেনি।

করেনি বাড়ির আর সকলের মুখের চেহারা দেখে। বিয়ে বাড়িতে ছিল তো কতজনা। সকলের মুখে যেন অবিশ্বাসের ছাপ।

তবু সকলেই লোক দেখানো আহা উঁহু হায় হায় করেছিল। সকলেই হুমড়ে পড়ে তাঁর ঘরে গিয়ে বসেছিল। তার সঙ্গে বসেছিল নতুন বিয়ের বরও। সমস্ত রাত ঠায় বসেছিল।

হাতে তার তখনও হলুদ মাখানো সুতো বাঁধা, রূপোর জাঁতিখানা সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে তখনও। যেমন ফিরছিল অতসীর হাতে কাজললতা।

স্বামীর মনের ভাব সেদিন বুঝতে পারেনি অতসী। বুঝতে পারেনি সেও তার বাপকে অবিশ্বাস করেছে কিনা।

কিন্তু শুধু সেদিন কেন?

কোন দিনই কি? কোন দিনই কি বুঝতে পেরেছে তাকে অতসী? শুধু তাঁকে দেখেছে ভেবেছে মানুষে কেন অকারণে রুক্ষ হয়, কেন নিষ্ঠুরতায় আমোদ পায়।

সবাই ওঘরে। শুধু একা অতসী ব্যর্থ ফুলশয্যার ঘরে খালি মাটিতে পড়ে থেকে কাটিয়ে দিয়েছিল।

একবার কি কাজে যেন সে ঘরে এসেছিল বিয়ের বরটা। এসেছিল কি একটা ওষুধ নিতে ব্যস্তভঙ্গীতে। তবু থমকে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল "এভাবে মাটিতে কেন? বিছানায় উঠে শুলে ভাল হত।"

বিছানা মানে সেই বিছানা।

যার উপর শিশি খানেক এসেন্স ঢেলে দিয়েছিল কে বা কারা, আর ফুল ছিল অনেক।

তারা হয়তো পাড়ার লোক, নিস্পর।

ভয়ানক একটা বিস্ময় এসেছিল সেদিন অতসীর।

ভেবেছিল ও কি সত্যিই মনে করেছিল অতসী মাটি থেকে উঠে একা ওই সুরভিসিক্ত রাজকীয় শয্যায় গিয়ে শোবে? এত নীরেট ও, এত ভাবলেশ শূন্য!

আর তা যদি না হয়, শুধু মৌখিক একটু ভদ্রতা মাত্র করতে এল ফুলশয্যার রাতে নব পরিণীতার সঙ্গে?

হৃদয়াবেগশূন্য এই সম্ভাষণে?

তবু তখনি মনকে সামলে নিল অতসী। ছি ছি একী ভাবছে সে? বাপের বাড়াবাড়ি অসুখ, এখন কি ও আসবে প্রিয়া সম্ভাষণে? তাহলেই তো বরং ঘৃণা আসতো অতসীর।

অতএব ধড়মড় করে উঠে বসে খুব আস্তে বলল, "আমি ওঘরে যাবো?"

"তুমি? না, তুমি আর গিয়ে কি করবে? তোমার যাবার কি দরকার? তুমি ঘুমোতে পার।"

বলে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে চলে গেল সে।

কী নীরস সংক্ষিপ্ত নির্দেশ! একটু মিষ্টি করে বলা যেত না?

তাড়াতাড়ি ভাবল অতসী, ছি ছি ওর বাবার অসুখ! যায় যায় অবস্থা!

আবার ভাবল, আচ্ছা, হঠাৎ যদি তাঁর কিছু হয়ে যায়! শিউরে উঠল ভাবতে গিয়ে।

তাহলে কী বলবে লোকে অতসীকে?

কত অপয়া!

কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবতে হলনা, ঝি এসে ডাকল "নতুন বৌদিদি, পিসীমা বলছে ওঘরে গিয়ে বসতে। যাও শ্বশুরের পায়ে হাত বুলোও গে যাও। এখন কি হয় কে জানে! ছেলে-অন্ত প্রাণ তো! যত আবদার ছেলের ওপর। সেই ছেলে হাতছাড়া হয়ে গেল, শোকটা সামলাতে পারছে না মানুষটা।"

হাতছাড়া!

অতসীর মনে হল, জীবনে এত দিন যে ভাষায় কথা কয়ে এসেছে সে, শুনেছে যে ভাষায় কথা, শুধু সেইটুকু মাত্রই বাংলা ভাষার পরিধি নয়। এ ভাষা তার কাছে ভয়ঙ্কর রকমের নতুন।

তবু উঠে গেল সেবায় তৎপর হতে।

আর গিয়েই প্রথম ধরা পড়ল সেই সন্দেহটা।

না, কিছু হয়নি ভদ্রলোকের। অকারণ কাতরতা দেখিয়ে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন বড় ছেলের হাত দুখানা। স্বাভাবিক মুখ, স্বাভাবিক নিশ্বাস। যেটা অস্বাভাবিক সেটা চেষ্টাকৃত।

কিন্তু শুধুই কি সেই একদিন?

দিনের পর দিন নয়?

মিথ্যা সন্দেহ নয়। সত্যিই রোগের ভান করে রাতের পর রাত ছেলেকে আঁকড়ে বসে রইলেন বৃদ্ধ। ছেলের চোখের আড়াল হলেই না কি মারা যাবেন তিনি।

যতবারই পিসশাশুড়ী বলেছেন, "ক'রাত জাগছে ছেলেটা, এইবার একটু শুতে যাক দাদা?" ততবারই বৃদ্ধ ঠিক তন্মুহূর্তেই চেহারায় নাভিশ্বাসের প্রাক্-চেহারা ফুটিয়ে তুলে মুখে ফেনা তুলে মাথা চেলে গোঁ গোঁ করে একাকার করেছেন। 'গেল গেল' রব উঠে গেছে, মুখে গঙ্গাজল, কানে তারকব্রহ্ম নাম! কতক্ষণে একটু সামলানো।

বিয়ের অষ্টাহ এই ভাবেই কেটেছিল।

তা অষ্টাহই বা কেন, যতদিন বেঁচেছিলেন সেই অভিনেতা বৃদ্ধ, ততদিনই প্রায় একই অবস্থায় কেটেছে অতসীর। অনবরত হার্টফেলের ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে দীর্ঘ চারটি বছর কাটিয়ে অবশেষে সত্যই একদিন হার্টফেল করলেন তিনি! কিন্তু ততদিনে জীবনের রঙ বিবর্ণ হয়ে এসেছে অতসীর, দিন রাত্রির আবর্তন যেন একটা যন্ত্রের মত হয়ে উঠেছে।

তারপর সীতু কোলে এল।

নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক জীবনের মাঝখানে নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা-হীন সেই আবির্ভাব!

দোষও দেওয়া যায় না কাউকে।

অভ্যর্থনার পরিবেশও নেই তখন। আচমকা ওপরওলার সঙ্গে খিটিমিটি করে চাকরী ছেড়ে দিয়েছে তখন সেই কাঠগোবিন্দ ধরনের মানুষটা। ছেলের জন্ম সংবাদে শুধু মুখটা একটু কুঁচকে বলল, "মেয়ে হয়ে এলে নুন খেয়ে খুন হতে হতো, সেই ভয়েই বোধকরি ছেলের মূর্তিতে এসেছে।"

পিসি সেই সেবার বিয়েতে এসেছিলেন, আবার এসেছেন এই উপলক্ষে। তিনি বললেন, "দেখ্ ছেলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ্ যেন সদ্য দাদার মুখ! দাদাই আবার ফিরে এসেছেন রে, বড্ড আকর্ষণ ছিল তো তোর ওপর!"

ঘরের মধ্যে থেকে ভয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল অতসীর। এ কী ভয়ঙ্কর কথা! এ কী সর্বনেশে কথা! যে মানুষটা তার জীবনের রাহু ছিল আবার সে ফিরে এল!

অতসীর ধারণা হয়েছিল প্রথম মিলনের পরম শুভলগ্নটা ব্যর্থ হতেই জীবনটা এমন অভিশপ্ত হয়ে গেছে তার। মন্ত্রের ধ্বনি বাতাসে মিশিয়ে গেছে শক্তিহারা হয়ে, প্রেমের দেবতা প্রতীক্ষা করে হতাশ হয়েই বোধকরি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে শর ছুঁড়ে চলে গিয়েছেন, সে শর পঞ্চশরের একটাও নয়। আলাদা কিছু।

আলাদা কোন বিষবাণ!

আর এ সমস্তর কারণ একজন নিষ্ঠুর লোকের স্বার্থপরতা!

জীবনের দল ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পেল না, অবকাশ হল না পরস্পরের মধ্যে কোমল লাবণ্য মণ্ডিত একখানি পরিচয় গড়ে ওঠবার।

তার আগেই রেঁধেবেড়ে স্বামীকে ভাত বেড়ে দিতে হল অতসীকে, কাচতে হল তার ছাড়া ধুতি, জুতোয় কালি লাগাতে হল, হল ভাঁড়ারে কি ফুরিয়েছে তার হিসাব জানাতে।

কিন্তু সুযোগ আর অবকাশ পেলেই কি সেই নিতান্ত বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন নীরস আর বিরস ধরনের মনটা কোমল লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারতো?

কে জানে পারতো কিনা। কিন্তু এটা দেখা গেল স্বার্থপরতায় আর ফিচলেমিতে সে তার বাপের ওপরে যায়। নিজের ছেলের প্রতিই হিংসেয় কুটিল হয়ে উঠছে সে মুহুর্মুহু। ছেলে কাঁদলেই রুক্ষ গলায় ঘোষণা করবে সে, "দাও দাও গলাটা টিপে শেষ করে দাও, জন্মের শোধ চীৎকার বন্ধ হোক।" ছেলে রাতে জেগে উঠে জ্বালাতন করলে বলতো, "ভালো এক জ্বালা হয়েছে, সারাদিন খাটবো খুটবো আর রাতে তোমার সোহাগের ছেলের সানাই বাঁশি শুনবো। বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও আপদটাকে নিয়ে। দেব, এবার ঢাকী সুদ্ধুই বিসর্জন দেব।"

ছেলে নিয়ে ছাতে চলে যেত অতসী, শীতের দিনে হয়তো বা ভাঁড়ারের কোণে।

তা সারাদিনের 'খাটা খোটার' গৌরব বেশীদিন ব্যাখ্যানা করতে হল না সেই লোকটাকে, এক দুরারোগ্য ব্যাধি এসে বিছানায় পেড়ে ফেলল তাকে। আর তার এই দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী করলো সে শিশুটাকে। 'অপয়া লক্ষ্মীছাড়া' শিশুটাকে।

ছেলের সঙ্গে রেষারেষি।

অতসীর সাধ্য সামর্থ্য সময় সব নিয়োজিত হোক তার নিজের জন্যে। ওই লক্ষ্মীছাড়াটার কিসের দাবী? বাসনমাজা ঝিটার কাছে পড়ে থাক্‌না ওটা! নয়তো বিলিয়েই দিকগে না ওকে অতসী!

এরপর তো ওই ছেলের হাত ধরে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে? তা আগে থেকেই ভার মুক্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

নিজে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছেলের মরণ কামনা করেছে লোকটা।

"মরে না! আপদটা সরেও না! দেখছি কাঠবেড়ালীর প্রাণ!"

রোগবিকৃত মুখটা কুটিল হিংসেয় আরও বিকৃত হয়ে উঠতো।

দুরারোগ্য রোগ, এ ঘরে ছেলে নিয়ে শোওয়া চলেনা, আর সেই নিতান্ত শিশুটাকে সত্যিই রাতে একা ঘরে-ফলে রেখে দেওয়া যায় না। কিন্তু যে মন কোনদিনই যুক্তিসহ নয়, সে মন ভাগ্যের এইমার খেয়ে কি যুক্তিসহ হবে? বরং আরও অবুঝ গোঁয়ার হয়ে ওঠে। ভাবে, ওই ছেলেটার ছুতো করে অতসী তার হাত থেকে পিছলে পালিয়ে যাচ্ছে।

জীবন তো গোণাদিনে পড়েছে, ফুরিয়ে আসছে জীবনের ভোগ, হাহাকার করা বুভুক্ষু চিত্ত নিংড়ে নিতে চায় শেষ ভোগরস।

যে মানুষগুলো আস্ত দেহ নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ছিঁড়ে কুটে ফেলতে পারলে যেন তার আক্রোশ মেটে।

সেই হতভাগা লোকটার মনস্তত্ত্ব তবু বুঝতে পারতো অতসী, কিন্তু সীতু কেন এমন?

কোন কিছু না বুঝেই, ও কেন এমন হিংস্র?

অন্যকে সুখী আর স্বচ্ছন্দ দেখলেই কি ওদের ভিতরের রক্তধারা শয়তানীর বিষবাষ্পে নীল হয়ে ওঠে ?

সকালবেলা জেগে উঠে দেখলো মৃগাঙ্ক ঘুমোচ্ছে, মুখে নির্মল একটা প্রশান্তি। দিনের বেলায় যেটা প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছে। বদলে গেল মন, ভারি একটা আনন্দে ছলছল করতে করতে স্নান করতে গিয়েছিল অতসী, অনেক উপকরণে সমৃদ্ধ স্নানের ঘর।

কিন্তু স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েই চমকে কাঁটা হয়ে গেল মৃগাঙ্কর প্রচণ্ড চীৎকারে।

ঘুম থেকে উঠেই কাকে এমন বকাবকি করছেন রাশভারী মৃগাঙ্ক ডাক্তার ? কেনই বা করছেন ? আবার কি সেদিনের মত জুতোর মধ্যে কাঁচের কুচি পেয়েছেন ?

না কাঁচের কুচি নয়, কাগজের কুচি।

কাগজের কুচি পেয়েছেন মৃগাঙ্ক। জুতোর মধ্যে নয়, জুতোর তলায়। যে কাগজের গোছাখানা কাল খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছিলেন মৃগাঙ্ক, হয়রান হয়েছিল অতসী। সকালবেলা বাড়ির সামনের ছোট্ট বাগানটুকুতে একপাক ঘুরে গাছ গাছালিগুলোর তদারক করা মৃগাঙ্কর বরাবরের অভ্যাস। আজও এসেছিলেন নেমে, এসে দেখলেন সারা জমিটায় কাগজের কুচি ছড়ানো।

সেই কালকের জার্নালখানা।

কে যেন দুরন্ত রাগে কুটি কুটি করে দাঁতে ছিঁড়ে ছড়িয়েছে !

কে ? কে ? কে করেছে এ কাজ ?

রাগে পাগলের মত হয়ে চেঁচামেচি করেছেন মৃগাঙ্ক, বাড়ির সবকটা চাকর বাকরকে ডেকে জড় করেছেন, তারপর হয়েছে রহস্য ভেদ।

আসামীকে এনে হাজিরও করেছে নেপ্‌বাহাদুর পাঁজাকোলা করে। কারণ অপরাধটা তার নিজের চক্ষে দেখা।

এখন অপরাধীর কানটা ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন মৃগাঙ্ক, আর প্রচণ্ড ধমক দিচ্ছেন, 'কেন করেছ এ কাজ ? বল কেন করেছ ? না বললে ছাড়বো না আমি।'

সকালবেলার ঘুমভাঙা মনে কোন অন্যায় দেখলে রাগটা বুঝি বেশীই হয়ে পড়ে। ঝাঁকুনির চোটে কানটা ছিঁড়ে যাবে মনে হচ্ছে।

অতসী নেমে এসেছে কোন রকমে একখানা শাড়িজামা জড়িয়ে, খুকুকে কোলে করে তার ঝিটাও।

'দাদা মাত্তে বাবা।'

হাঁ করে কেঁদে ওঠে খুকু।

আর অতসীর আর্তনাদটাও খুকুর মতই শোনায়।

'মরে যাবে যে ! কি করছ ?'

'অমন ছেলের মরাই উচিত।' বলে পরিস্থিতিটার দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে চলে যান মৃগাঙ্ক।

আস্তে আস্তে সকলেই চলে যায় আপন কাজে, সময় মত খায়-দায়। শুধু বাগানের এককোণে ঘাড় গুঁজে অভুক্ত বসে থাকে একটা দুর্মতি শিশু, আর নিজের ঘরের এককোণে তেমনি বসে থাকে অতসী। আজ বুঝি খুকুর কথাও মনে নেই তার।

মৃগাঙ্ককে দোষ দেবার তো মুখ নেই অতসীর, তবু তার প্রতিই অভিমানে ক্ষোভে মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বারবার মনে হয়, সে একটা অবোধ শিশু বৈ তো নয়, তার প্রতি এত নিষ্ঠুরতা সম্ভব হল এ শুধু অতসীর একার সন্তান বলেই তো?

খিদেয়, গরমে ঘাড় গুঁজে বসে থাকার কষ্টে, আর কানের জ্বালায় দুঃখের অবধি নেই, তবু আজ মনে ভারি আনন্দ সীতুর।

বাবার খুব একটা অনিষ্ট করতে পারা গিয়েছে ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছে তার। বোঝাই যাচ্ছে জিনিসটা খুব দরকারী।

হোক মার খেতে, হোক বকুনি খেতে, তবু সীতু এমনি করে জ্বালাতন করবে বাবাকে। দরকারি জিনিস নষ্ট করে দিয়ে, জুতোর মধ্যে কাঁচের কুচি পুরে, আর প্যান্টের পকেটে ধারালো ব্লেড্ ভরে রেখে।

ধারালো ব্লেড্। সীতুর মনের মতই ধারালো।

সেটা এখনো বাকি আছে।

প্যান্টের যে পকেটে টাকার ব্যাগ আর গাড়ির চাবি থাকে মৃগাঙ্কর, সেই পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে সীতু সেই সংগ্রহ করে রাখা ব্লেড্খানা। পকেটে হাত ভরে জিনিস নিতে গেলেই, হি হি চমৎকার! আরো অনেক জ্বালাতনের চিন্তা করতে থাকে সীতু। জ্বালাতন করে করে বাবাকে মরিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় তার।

হঠাৎ কোথা থেকে কাদের কথা কানে আসে। ফিস ফিস কথা।

কি কথা এসব?

কার কথা? কার গলা?

'য্যাতোই হোক, কাঁচা ছেলে বৈ তো নয়, করে ফেলেছে একটা অকম্ম, তা বলে কি আর অমন মারটা মারে? আপনার ছেলে হলে কি আর পারতো?'

এ গলা বাসন মাজা ঝি সুখদার।

উত্তর শোনা যায় বামুন-মেয়ের গলায়, 'তুই থাম্ সুখী, নিজের বাপে শাসন করে না? মেরে পাট করে দেয় না অমন ছেলেকে? ছেলের গুণ জানিস তুই? আমার বিশ্বাস পুঁটকে ছোঁড়া জানে সব। তা নইলে কর্তার ওপর অত আক্রোশ কিসের?'

বিহ্বল হয়ে এদিক ওদিক তাকায় সীতু।

কার কথা বলছে ওরা ?

কোন ছেলে সে ? কে তাকে শাসন করেছে ? 'নিজের বাপ' 'আপনার ছেলে' এ সব কী কথা ? কী জানে সীতু ?

ভয় ! ভয় !

হঠাৎ সমস্ত শরীরে কাঁপুনি দিয়ে ভয়ানক একটা ভয় করে আসে সীতুর। বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে যায়, আর ওর সেই আবছা আবছা ছবিটা কি রকম যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মনে পড়েছে, ঠিক মনে পড়েছে।

জানলায় বসা সেই ছেলেটা আর কেউ নয়, সীতু।

সীতু সে বাড়ির ! নল দিয়ে জলপড়া চৌবাচ্চাওলা ভাঙা ভাঙা সেই বাড়িটার। সীতু এখানের কেউ নয়, এদের কেউ নয়।

ভয়, ভয়, ভয়ানক ভয় !

কী কাঁপুনি !

কী কষ্ট ! ভয়ে এত কষ্ট হয় ?

আজ আর কিছুতেই কাজে মন বসে না মৃগাঙ্কর। নিজের সকালের সেই মাত্রাহীন অসহিষ্ণুতার কথা মনে পড়ে লজ্জায় কুণ্ঠায় বিচলিত হতে থাকেন।

ছি ছি, ক্রোধের এমন উন্মত্ত প্রকাশ মৃগাঙ্কর মধ্যে এল কি করে ? অত গুলো চোখের সামনে অমন নির্লজ্জ অসভ্যতা করলেন কি করে তিনি ? কানটা কি যথাস্থানে আছে ছেলেটার ? না ছিঁড়ে পড়ে গেছে ?

অতসী কি আজ কথা বলেছে ? খেয়েছে ? খুকুকে খাইয়েছে ?

বাড়ী গিয়ে কি অতসীকে দেখতে পাবে মৃগাঙ্ক ? না কি সে তার ছেলে নিয়ে কোথাও চলে গেছে ?

দু'লাইন চিঠির মারফতে নিষেধ করে গেছে খুঁজতে ?

বড় বেশী হয়ে গিয়েছিল !

কিন্তু ছেলেটা যে কিছুতেই কাঁদে না, দোষ স্বীকার করে না, 'আর করব না' বলে না ! মানুষের তো রক্তমাংসের শরীর ! কত সহ্য করা যায় ?

মনে করলেন, যদি ঈশ্বর অনুগ্রহে যথাযথ সব দেখতে পান, তাহলে নিজেকে আশ্চর্য্য রকম বদলে ফেলবেন তিনি।

অবহেলা করবেন ওই ছোট ছেলেটার সমস্ত দৌরাত্মি। শান্ত হবেন, সহিষ্ণু হবেন, উদার ক্ষমাশীল হবেন। আর কিছুতেই বিচলিত হবেন না।

ভাবলেন, ছি ছি, ও কি আমার রাগের যোগ্য, ও কি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ? ওর বাচ্চা বুদ্ধির শয়তানী কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে ডাক্তার মৃগাঙ্ক মোহনের ?

অতসীর জন্যে মমতায় মনটা ভরে ওঠে। তার প্রতিও বড্ড অবিচার করা হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই তো তার কি দোষ?

এতদিনের অসাবধানতা আর ত্রুটির পূরণ করে নেওয়ার মত জোরালো কী নিয়ে গিয়ে দাঁড়ানো যায় অতসীর সামনে? কতটা স্নেহ সমাদর আদর?

ভাবতে ভাবতে আবার চিন্তার ধারা অন্য খাতে বইতে থাকে।

সীতু অত ওরকম করেই বা কেন?

এই বিকৃত বুদ্ধির কারণ কি শুধুই বংশগত? না কি ও মৃগাঙ্কর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধটা বোঝে?

কেউ কি ওকে কিছু বলেছে?

কিন্তু কে বলে দেবে?

কার এত সাহস?

মৃগাঙ্কর আদেশ অমান্য করতে পারে এতবড় দুর্জয় সাহসধারী কে আছে? অতসীই বলেনি তো?

কিন্তু অতসীর তাতে স্বার্থ কি?

তবে কি ওর সব মনে আছে?

তাই কি সম্ভব?

কত বয়েস ছিল ওর তখন? বড় জোর দুই! কিন্তু তখন থেকেই কি ছেলেটা অমনি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন নয়?

সেই প্রথম দিনকার স্মৃতি থেকে তন্ন তন্ন করে মনে করতে থাকেন, কে কাকে প্রথম বিরুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিল। তিনি সীতুকে, না সীতু তাঁকে?

একেবারে প্রথম কবে দেখেছিলেন ওকে?

সুরেশ রায়ের সেই বাড়াবাড়ি অসুখের দিন না? চোখ উল্টে মুখে ফেনা ভেঙে একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল বললেই হয়।

অতসী পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, বেতপাতার মত, আর রোগা কাঠিসার ছেলেটা অবিরত তাঁর আঁচল ধরে টানছিল আর কাঁদছিল—'মা তলে আয়, মা ওখান থেকে তলে আয়।'

দেখেই কেন কে জানে রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গিয়েছিল মৃগাঙ্কর। সহসা ইচ্ছে হয়েছিল ওটাকে টিকটিকি আরশোলার মত ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেন ঘরের বাইরে।

সেই প্রথম দেখা!

সেই বিরূপতার সুরু।

তারপর অনেক ঝড়ের পর যখন অতসীকে নিয়ে এলেন ঘরে, বিবাহের দাবির মধ্য দিয়ে, তখন তার ছেলের যত্ন আদরের ত্রুটি রাখেননি ঠিক কথা, কিন্তু সেটা কি আন্তরিক?

আপন অন্তর হাতড়ে আজ সেই ছ'বছর আগের দিনগুলোকে বিছিয়ে ধরে নিরীক্ষণ করছেন মৃগাঙ্ক। দেখছেন যা কিছু করেছেন সীতুর জন্যে, তার সবটাই অতসীর মন প্রসন্ন রাখার তাগিদে, না কিছুটাও সত্যবস্তু ছিল?

হতাশ হচ্ছেন মৃগাঙ্ক, নিজের মনের চেহারা দেখে হতাশ হচ্ছেন। এমন করে তলিয়ে নিজেকে দেখা বুঝি কখনো হয়নি।

নইলে অনেক আগেই বুঝতে পারতেন, সেই রোগা হ্যাংলা কাঠিসার ছেলেটাকে কোন দিনই সহ্য করতে পারেননি তিনি। অবিরতই তাকে প্রতিদ্বন্দ্বীর মত মনে হয়েছে।

হোক সে অতসীর সন্তান, তবু তা'কে মৃগাঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী বললে ভুল হবে না। সে যে সুরেশ রায়েরও সন্তান, সে কথা বিস্মৃত হওয়া যাবে কি করে? সুরেশের সন্তান বলে কি অতসী ওকে এতটুকু কম ভালবেসেছে কোনদিন? বুঝি বা—মৃগাঙ্ক একটু থামলেন, তারপর আবার ভাবনাটাকে এগিয়ে দিলেন—বুঝি বা মৃগাঙ্কর সন্তানের চাইতে বেশীই ভালবাসে। হ্যাঁ বেশীই। মুখে যতই ঔদাসীন্য অবহেলা দেখাক, সীতুর দিকে তাকিয়ে দেখতে চোখে সুধা ঝরে ওর।

সেই, সেটাই অসহ্য মৃগাঙ্কর। সেই সুধাঝরা দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিস্নাত জীবটাও তাই অসহ্য ওকে অতসীর কাছাকাছি দেখলেই মনে পড়ে যায়, সেই কদর্য কুৎসিত রোগগ্রস্ত লোকটাকে মনে হয় তাকে কিছুতেই মুছে ফেলা যাবে না অতসীর জীবন থেকে।

তবু এখন আর এক দিক থেকে ভাবছেন মৃগাঙ্ক। তিনি যদি সেই শীর্ণ অপুষ্ট নিতান্ত অসহায় শিশুটাকে বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে না দেখতেন, যদি অতসীর সামনে সস্নেহ ব্যবহার করে, আর অতসীর আড়ালে জলন্ত দৃষ্টিতে না তাকাতেন ওর দিকে, তা' হলে হয়তো ছেলেটাও এত হিংস্র হয়ে উঠত না।

এত জাতক্রোধের ভাব থাকত না তার উপর।

কিম্বা কে জানে থাকত হয়তো। তার সহজাত সংস্কারই জাতক্রোধের মূর্তিতে ভিতর থেকে ঠেলা মারতো তাকে। সেই সংস্কারই তাকেও শেখাতো মৃগাঙ্ক ডাক্তারকে প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখে দেখতে। ইতর প্রাণীরা তো আপন জন্মদাতাকেও তাই দেখে।

তবু আজ সত্যই অনুতপ্ত মৃগাঙ্ক ডাক্তার। সত্যই তাঁর ভাবতে লজ্জা হচ্ছে যে ভিতরের সমস্ত গলদ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

অতসীকে কি তিনি আর সম্পূর্ণ করে পাবেন? তার মনের দরজা কি চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল না?

কিন্তু অতসীর সম্পূর্ণ মনটা কি তিনি কোনদিনই পেয়েছেন? পাওয়া যায় কি? কুমারী মেয়ের মন কোথায় পাবে, সংসারে পোড় খাওয়া একখানা পুরনো মন?

পুরনো জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা ছিল অতসীর, কিন্তু সেই আগেকার আত্মীয় স্বজনের উপর তো কই বিতৃষ্ণা নেই!

ওই যে একটা মেয়ে মাঝে মাঝে আসে, অতসীকে 'কাকীমা কাকীমা' বলে বিগলিত হয় ও কি মৃগাঙ্কর ভাইঝি?

তাতো নয়। ওকে মৃগাঙ্ক চেনেনও না। ও সেই সুরেশ রায়ের ভাইঝি। সে এলে অতসীর মুখে যেন একটা নতুন লাবণ্যের আলো ফুটে ওঠে, তাকে আদর যত্ন করে খাওয়াবার চেষ্টায় তৎপর হয়ে ওঠে।

দেখে অবশ্য খুব ভাল লাগে না মৃগাঙ্কর, তবু বলেনও না কিছু। হঠাৎ একদিন, এই সেদিন, মেয়েটা না বলা না কওয়া দুম্ করে মৃগাঙ্ক ডাক্তারের ঘরে ঢুকে 'কাকাবাবু' বলে ঢিপ করে এক প্রণাম।

শিউরে উঠেছিলেন মৃগাঙ্ক।

মেয়েটা কিন্তু বেজায় সপ্রতিভ। তবে হৈ চৈ করে যতই সে মৃগাঙ্ককে 'কাকাবাবু' কাকাবাবু' করুক, মৃগাঙ্ক তো কিছুতেই পারলেন না তাকে সস্নেহে স্বচ্ছন্দে আত্মীয় বলে মেনে নিতে! বাচ্চা একটা ছেলের চিকিৎসার জন্যে অনুরোধ করলো সে মৃগাঙ্ককে, আড়ষ্টভাবে দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন মৃগাঙ্ক, এই পর্যন্ত।

কেন আড়ষ্ট হলেন তিনি?

ভাবলেন মৃগাঙ্ক। অতসীর যে একটা অতীত ছিল এটা তো স্বীকার করে নিয়েই অতসীকে ঘরে এনেছিলেন, তবে কেন সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারেন না?

মেয়েরা ঈর্ষাপরায়ণ, মেয়েরা সপত্নী-অসহিষ্ণু, মেয়েরা কৈকেয়ীর জাত, কিন্তু পুরুষের উদারতার সোনাটুকু কি কোনদিন বাস্তব আঘাতের কষ্টিপাথরে ফেলে যাচাই করে দেখা হয়েছে?

এই তো! যাচাই করতে বসলে তো সব সোনাই রাং। মন থেকে প্রসন্ন হয়ে যদি সুরেশ রায়ের ভাইঝিকে গ্রহণ করতে পারতেন মৃগাঙ্ক, যদি পারতেন সুরেশ রায়ের সন্তানকে একেবারে নিতান্ত স্নেহের পাত্র বলে গ্রহণ করতে, তবেই না বলা যেত—পুরুষ মহৎ, পুরুষ উদার, পুরুষ স্ত্রীলোকের মত ঈর্ষাপরায়ণ ক্ষুদ্র চিত্ত নয়!

মৃগাঙ্ক ভাবলেন, সপত্ন সম্পর্ক সম্বন্ধে পুরুষ বোধকরি মেয়েদের চাইতে অনেক বেশী কুটিল ক্ষুদ্রচেতা ঈর্ষাপরায়ণ।

ভাবলেন, আরো অনেক আগে এভাবে আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত ছিল তাঁর।

"কে বলেছে এ কথা?"

তীক্ষ্ণ প্রশ্ন নয়, যেন হতাশ নিশ্বাস! সেই হতাশ নিশ্বাস থেকেই আবার প্রশ্ন হয়, "বলেছে বলেই তাই বিশ্বাস করেছ তুমি? তুমি কি পাগল?"

কিন্তু প্রশ্ন করবারই বা কি আছে? সীতু যে পাগল নয় এ প্রমাণ তো দিচ্ছে না। পাগলের মতই তো করছে সীতু। বিছানায় মাথা ঘসড়াচ্ছে, আর বলছে, "না, তুমি মিথ্যে কথা বলছো। আমার বাবা মরে গেছে। আমি এখানে থাকব না, আমি চলে যাব, আমি মরে যাব।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে থাকতে হবে না এখানে", অতসী তেমনি হতাশ কণ্ঠে বলে, "তোমার অন্য ব্যবস্থা করবো। শুধু যে কটা দিন তা না হচ্ছে, একটু শান্তিতে থাকতে দাও আমায়।"

"না না" পাগলের মতই গোঁ গোঁ করছে সীতু, 'আমি এক্ষুনি চলে যাব। আমি এক্ষুনি চলে যাব।"

"চলে যাবি! আমার জন্যে তোর মন কেমন করবে না?"

"না না না। তুমি খুকুর মা, তুমি এদের বাড়ীর লোক।"

অতসী এবার দপ্ করে জলে উঠে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "রোসো, সত্যিই তোমাকে বোর্ডিঙে রাখবার ব্যবস্থা করছি আমি।"

"বলছি তো আমি এক্ষুনি চলে যাব।"

'যা তবে। কোন চুলোয় তোর সেই পূর্বজন্মের বাড়ি আছে, যা সেখানে। হবেই তো, এর চাইতে ভাল বুদ্ধি আর হবে কোথা থেকে? কৃতজ্ঞতা কি তোদের হাড়ে আছে? বলছি যত শীগগির পারি তোমায় বোর্ডিঙে দেব, আজ এক্ষুনি সেটা শুধু সম্ভব নয়। একটা দিন আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

"তুমি কেন মিথ্যে কথা বলেছিলে? কেন বলেছিলে ওটা আমার বাবা?"

'বেশ করেছি বলেছি।' একফোঁটা একটা ছেলের কাছে আর হারতে পারে না অতসী। নিষ্ঠুরতার চরম করবে সে। তাই ঝাঁজালো গলায় তেতো স্বরে বলে ওঠে, 'কি করবি তুই আমার? এখানে যদি না আসতিস, খেতে পেতিস না, পরতে পেতিস না, বাড়িওলা দূর দূর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতো, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে হতো বুঝলি? যে মানুষটা এত যত্ন করে মাথায় করে নিয়ে এল, তাকে তুই—উঃ এই জন্যেই বলে দুধকলা দিয়ে সাপ পুষতে নেই!'

'মেরে ফেল, মেরে ফেল আমাকে।'

'মেরে তোকে ফেলব কেন, নিজেকেই ফেলবো।' অতসী গম্ভীর ভাবে বলে, 'সেইটাই হবে তোর উপযুক্ত শাস্তি।'

"কাকীমা!"

দরজার বাইরে থেকে ধ্বনিত হ'ল এই পরিচিত কণ্ঠটি। হ'ল বেশ শান্তকোমল স্বরেই,

কিন্তু সে স্বর অতসীর শুধু কানেই নয়, বুকের মধ্যে পর্যন্ত ঝনাৎ করে গিয়ে লাগল। লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাত পা শিথিল হয়ে এল তার।

এ কী!

এ কী বিপদ! বেড়াতে আসার আর সময় পেল না শ্যামলী? এই যে ছেলেটা খাটের ওপর মুখগুঁজে গড়াগড়ি খাচ্ছে, এ দৃশ্য তো শ্যামলী এখনি এসে দেখে ফেলবে। কী কৈফিয়ৎ দেবে অতসী তার? শ্যামলী কি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাবে না? ভাববে না কি কোথাও কোন ঘাটতি ঘটেছে? তাছাড়া সীতু ওকে দেখে আরও গোঁয়ার্তুমি, আরও বুনোমি করবে কি না, কে বলতে পারে? হয়তো ইচ্ছে করে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে যে অবস্থাকে কিছুতেই আয়ত্তে এনে সভ্য চেহারা দেওয়া যাবে না।

"কাকীমা আসছি।" পর্দায় হাত লাগিয়েছে শ্যামলী। মুহূর্তে সমস্ত ঝড় সংহত করে নিয়ে সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা বলে ওঠে অতসী, "আয় আয়, বাইরে থেকে ডেকে পারমিশান নিয়ে—এত ফ্যাসান শিখলি কবে থেকে?"

শ্যামলী একমুখ হাসি আর বড একবাক্স সন্দেশ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

নিজের খুসির ছটায় পারিপার্শ্বিকের দিকে দৃষ্টি পড়ে না শ্যামলীর, এগিয়ে এসে সন্দেশটা অতসীর দিকে বাড়িয়ে ধরে, "নিন! বাট্টুর সেরে ওঠার মিষ্টি খান!"

"কি আশ্চর্য! এসব কি শ্যামলী? না না এ ভারী অন্যায়!"

"অন্যায় মানে? অতদিন ধরে ভুগছিল ছেলেটা, আমরা তো হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কোনও ডাক্তার রোগ ধরতে পারছিল না। ডাক্তার কাকাবাবুর দু'দিনের দেখায় সেরে উঠল, এ আহ্লাদের কি শেষ আছে? নেহাৎ না কি ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করা চলেনা, তাই কাকাবাবুকে একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে—"

ভারী বাক্যবাগীশ মেয়েটা।

কিন্তু দ্বিধা চিন্তা কিছু নেই, সাদাসিধে সরল। কথা যখন বলে, তাকিয়ে দেখে না তার প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে। এই জন্যেই তো সুরেশ রায়ের বংশের মধ্যে এই মেয়েটাকেই বিশেষ একটু স্নেহের চক্ষে দেখতো অতসী। সুরেশ রায়ের জ্যেঠতুতো দাদার মেয়ে। শ্যামলা রং, হাসিখুসি মুখ, গোলগাল গড়ন, বছর আষ্টেকের মেয়েটা, বিয়ের কনে অতসীর সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্রই অতসীর মন হরণ করে নিয়েছিল। শ্যামলীও কাকীমার মধ্যে যেন বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছিল।

তারপর তো অতসীর দিকে কত ঝড, কত বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, আরও কত কি! আর শ্যামলীর দিকে প্রকৃতির অকৃপণ করুণা। স্কুলের পড়া সাঙ্গ হতে না হতেই ভাগ্যে জুটে গেছে দিব্যি খাসা বর, সংসার করছে মনের সুখে স্বাধীনতার আরাম নিয়ে। বড়লোক না হলেও অবস্থা ভাল, আর স্বামীটির প্রকৃতি অতীব ভাল। সরল, হাস্য মুখ। দুটো ছেলেমানুষে মিলে যেন খেলার সংসার পেতেছে!

বিধাতার আশ্চর্য নির্বন্ধ, সে সংসার পেতেছে অতসীরই বাড়ীর কখানা বাড়ী পরে। আগে জানত না দু'জনের একজনও, দেখা হয়ে গেল দৈবাৎ।

পাড়ার বইয়ের দোকানে সীতুকে নিয়ে তার নতুন ক্লাশের বই কিনতে গিয়েছিল অতসী, আর শ্যামলীও এসেছে ছোট ছেলের জন্যে রঙিন ছবির বই কিনতে। অসুস্থ ছেলে রেখে এসেছে ঘরে, তার মন ভোলাতে বাছাই করছে নানা রঙবেরঙের ছবি-ছড়া। ছেলে নিয়ে দোকানে উঠেই অতসী যেন পাথর হয়ে গেল!

এ কী অভাবিত বিপদ!

এই দণ্ডে কি সীতুকে টেনে নিয়ে দোকান থেকে নেমে যাবে অতসী? না কি না দেখার ভান করবে?

দুটোর কোনটাই হ'লনা, চোখোচোখি হয়ে গেছে। আর চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামলী লাফিয়ে উঠেছে, "কাকীমা!"

এরপর আর কি করে না দেখার ভান করবে অতসী? কি করে চট করে নেমে যাবে দোকান থেকে?

ফিকে হাসি হাসতেই হয়, মুখে কথা জোগাবার আগে। কিন্তু শ্যামলী ওসব ফিকে ঘোরালোর ধার ধারে না। পূর্বাপর ইতিহাস, বর্তমান পরিস্থিতি, কোন কিছুই তার উল্লাসকে রোধ করতে পারে না। দোকানের মাঝখানেই একে ওকে পাশ কাটিয়ে অতসীর গায়ে হাত ঠেকিয়ে বলে ওঠে, "ওঃ কাকীমা, কতদিন পরে! বাবাঃ!"

অতসীর প্রবল শক্তি আছে ঝড়কে মনের মধ্যে বহন করে বাইরে সহজ হবার, তবু বুঝি অবিচলিত থাকা সম্ভব হয় না। তবু বুঝি কথা কইতে ঠোঁট কাঁপে, "তুমি এখানে?"

"ওরে বাবা, আমাকে আবার তুমি! এই দুষ্টু মেয়েটাকে বুঝি ভুলেই গেছেন কাকীমা? ওসব চলবে না, 'তুই' বলুন!"

এবার অতসী সত্যিকার একটু হাসে, "বলছি। এখানে আর কি কথা হবে?"

"এখানে মানে? ছাড়বো না কি? ধরে নিয়ে যাব না? বইটই কেনা এখন থাক, চলুন চলুন। বাবাঃ, কত দিন পরে! আপনার কার জন্যে বই? ওমা সীতু না? কত বড়টি হয়ে গেছে ইস! কিন্তু সেই রকম রোগা আছে।"

কথা, কথা, কথার স্রোত একেবারে! দোকানের লোকেরা যে হাঁ করে শুনছে তাও খেয়াল নেই মেয়েটার।

শুধু ওই জন্যেই দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ে অতসী। কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলে, "তুমি এখানের দোকান থেকে কেনা কাটা কর বুঝি?"

"আবার 'তুমি!" অভ্যাস বদলান। এই দোকান থেকে কেনা কাটা করব না! এই তো পাড়া আমাদের। ওই মোড়ের মাথায় প্রকাণ্ড লালরঙা বাড়ীটা? ওখানেই একটা ফ্ল্যাটে থাকি। দোতলার ফ্ল্যাট। অত কথায় কাজ কি, চলুন।"

অতসী অনুভব করছে তার হাতের মধ্যে ধরা সীতুর হাতটা কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠেছে, চকিত দৃষ্টি ফেলে দেখছে, যাকে বলে বিস্ময় বিস্ফারিত, তেমনি দৃষ্টি ফেলে নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে আছে সীতু এই বাক্যচ্ছটাময়ীর হাসিতে উচ্ছল খুসিতে টলমল মুখটার দিকে।

অমন করে দেখছে কেন?

শুধুই অপরিচিতার প্রতি শিশু মনের কৌতূহল? না কি এমন হাসিতে উচ্ছল খুসিতে টলমল মুখ সে জীবনে কখনো দেখেনি বলে অবাক হয়ে গেছে?

নয় তো কী! নয় তো কী! মনে মনে শিউরে উঠছে অতসী, এই আকস্মিকতার সূত্র ধরে এক বিস্মৃত অতীতকে মনে পড়ে যাচ্ছে সীতুর? পরতে পরতে খুলে পড়ছে চেতনার কোনও স্তর?

এ কী বিপদ, এ কী বিপদ!

অন্যমনস্ক মেয়েটা কি শুধুই অন্যমনস্ক? ভেবেছিল সেদিন অতসী। না কি এই অজস্র কথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভয়ঙ্কর একটা ভারী জিনিসকে ঠেলে পার করে নিয়ে যেতে চায় সে? তাই অন্যমনস্কতার ভান করে এই ঢেউ দেওয়া, ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেওয়া।

শুধু কথা নয়, রাস্তার মাঝখানে প্রায় হাত ধরেই টানাটানি করেছিল সেদিন শ্যামলী অতসীকে, তবু হেসে মিনতি করে সে অনুরোধ কাটিয়ে পালিয়ে এসেছিল অতসী, আর নিতান্ত ভদ্রতার দায়ে নিতান্ত মৌখিক ভাবেই বলতে বাধ্য হয়েছিল, "বেশ তো, তুইও তো চলে আসতে পারিস!"

"ও বাবা! সে আবার বলার অপেক্ষা?" শ্যামলী হেসে উঠেছিল, "সে তো আমি না বলতেই যাবো। গিয়ে গিয়ে পাগল করে তুলবো। একবার যখন সন্ধান পেয়ে গিয়েছি।"

তা কথা রেখেছে শ্যামলী। কেবলই এসেছে। অতসী অস্বস্তি পাচ্ছে কি বিব্রত হচ্ছে, সে চিন্তা মাথায় আসেনি তার। ওকে দেখলে অতসীর মনটা স্নেহে কোমল হয়ে আসে—কেবলমাত্র নিজস্ব এই একটা অদ্ভুত সুখানুভূতির রোমাঞ্চে, যেন নিষিদ্ধ ভালবাসার স্বাদ পায় তবু অতসীর পূর্বজীবনের একটা টুকরো যে বারবার এসে মৃগাঙ্কর চোখকে আর মনকে ধাক্কা মেরে যাবে, এটাতেও স্বস্তি পায় না।

কিন্তু এই অবুঝ ভালবাসাকে ঠেকাবেই বা সে কি করে? কি করে বলবে "তুই আর আসিস না শ্যামলী!"

তার উপর আর এক ঝামেলা।

শ্যামলী তার ছেলেকে দেখাতে চায় মৃগাঙ্ক ডাক্তারকে। শুনে মনটা বোদা বিস্বাদ হয়ে

গিয়েছিল অতসীর। বেশ একটা বিরক্তি এসে গিয়েছিল তার উপর। এ তো বড় ঝঞ্ঝাট! এ আবার কী উপদ্রব! মনে হয়েছিল, নাঃ এ সবে দরকার নেই, স্পষ্টাস্পষ্টিই বলে দেবে শ্যামলীকে, এতে অতসী অস্বস্তি বোধ করে।

কিন্তু বলতে গিয়েও বলা যায় না। তাই ছেলের কী এমন হয়েছে সেটাই জিজ্ঞেস করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কী হয়েছে!

সেইটাই তো রহস্য!

কী যে হয়েছে বুঝতে পারছে না কোনও ডাক্তার বদ্যি। লক্ষণের মধ্যে, শুধু পায়ের হাড়ে ব্যথা, শুধু দুর্বলতা। অথচ বারবার 'এক্সরে' করেও ব্যথার কোনও উৎস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যথেষ্ট পরিমাণে যথোপযুক্ত খাইয়েও দুর্বলতা ঘোচানো যাচ্ছে না।

মৃগাঙ্ক যে 'বোন্' স্পেশালিষ্ট এটা যেন শ্যামলীরই গ্রহমুক্তির একটা নিদর্শন!

"মনে আশা হচ্ছে কাকীমা, এতদিনে হয়তো ফাঁড়া কাটল। নইলে খোকার যা অসুখ করেছে, ডাক্তার কাকাবাবু ঠিক তারই স্পেশালিষ্ট হলেন কেন!" বলেছিল শ্যামলী।

অতসী অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছিল ওর মুখের দিকে। কী সুখী এই নির্বোধ মানুষগুলো! এরা কত সহজেই সহজ হতে পারে!

রোখা গেল না শ্যামলীকে।

কি করে যাবে? কোন অমানবিকতায়? একটা শিশুর দুরারোগ্য ব্যাধির কাছে কি অতসীর তুচ্ছ মানসিক বাধার প্রশ্ন?

বিবেককে কী জবাব দেবে, যদি শ্যামলীকে ফিরিয়ে দেয়?

বলতে হ'ল মৃগাঙ্ককে।

মৃগাঙ্ক রাগ করল না, বিদ্রূপ করল না, আপত্তিও করল না, শুধু অতসীর মুখের দিকে একবার স্পষ্ট পরিষ্কার চোখে চেয়ে বললো, "নিয়ে এস।"

তা নিজে নিয়ে আসেনি অতসী। শ্যামলীকেই পাঠিয়ে দিয়েছিল ছেলে সঙ্গে দিয়ে, এবং গম্ভীরমূর্তি মৃগাঙ্কমোহন গভীর যত্নের সঙ্গেই দেখেছিলেন রোগীকে। আর জানিয়েছিলেন, হাড়ে কিছুই হয়নি, ব্যথার উৎস পেশীতে।

দুর্বলতা?

সেটা ভুল চিকিৎসার প্রতিক্রিয়া।

বার দুই দেখা আর ওষুধ দেওয়াতেই অদ্ভুতভাবে কাজ হ'ল। অতসী এতটা আশা করেনি।

ওদিকে শ্যামলী আর তার স্বামী বিগলিত।

তারপর থেকে দ্রুত উন্নতি হয়েছে। বেড়েছে ওজন। সেই ওজন বাড়ার সূত্র ধরেই আজ শ্যামলীর এত দুঃসাহস।

হ্যাঁ, সেই কথাটাই মনে হল অতসীর। মৃগাঙ্ককে সন্দেশ খাওয়াতে চায়! কী দুঃসাহস, কী ধৃষ্টতা!

অথচ শ্যামলীকে বলা চলে না সে কথা। তাই হাত পেতে নিতে হয় সেই সন্দেশ সম্ভার। যেটা বিপদের ডালির মত।

"ছেলেকে এবার আনিস একদিন।" বললো অতসী, "এখন তো হাঁটতে পারবে।"

"ও বাবা নিশ্চয়!"

শ্যামলী কেন সাধারণ ভদ্রতা বা সাধারণ সৌজন্যটুকুর মানে বোঝে না? কেন সেই মুখের কথাটাই বড় করে ধরে?

আজ যেন ফেরার তাড়া মাত্রও নেই শ্যামলীর, জাঁকিয়ে বসে কথা কইছে তো কইছেই।

"বুঝলেন কাকীমা, আপনার জামাই বলেন, 'ডাক্তার কাকাবাবু শুধু ডাক্তারই নয়, যাদুকরও। নইলে দেখালামও তো এ পর্যন্ত কমজনকে নয়, কেউ বুঝতে পারল না, আর উনি দেখলেন আর—"

"মোটেই ভাল ডাক্তার নয়!"

হঠাৎ একটা তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় মন্তব্যে শিউরে চমকে উঠল ঘরের আর দুজন।

বিছানার কোণ থেকে চেঁচিয়ে উঠেছে সীতু।

"ওমা, ও কিরে সীতু, ও কথা বলতে আছে?" শ্যামলী অবাক হয়ে বলে, 'খুব ভাল ডাক্তার তো!"

"ছাই ভাল।" বিদ্বেষে তিক্ত শিশুর কণ্ঠ কি কুৎসিত! ভাবল অতসী।

আর শ্যামলী ভাবল ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী। নিশ্চয় কোন কারণে বাপের ওপর রাগ হয়েছে ছেলের। পরক্ষণেই ভাবল—তা' বাপ ছাড়া আর কি? উপকারী আর স্নেহশীল মানুষকে পিতৃতুল্যই বলা হয় বৈ কি। ইনি যদি এমন উদারচিত্ত না হতেন, কোথায় আজ দাঁড়াত অতসী? কে জানে কোথায় ভেসে যেত সীতু!

ওবাড়ীর ছোটকাকার কী না কী অবস্থা ছিল, শ্যামলী তো আর ভুলে যায়নি? কী হালে কাটিয়েছে অতসী আর সীতু, তাও দেখেছে সে।

আর এখন?

এই রাজপুরীর কুমার হয়ে সুখের সাগরে গা ভাসিয়ে থাকা! কম ভাগ্য! এ বাড়ীর সাজসজ্জা আরাম আয়োজন ঔজ্জ্বল্য চাকচিক্য শ্যামলীকে মুগ্ধ করে।

বাড়ীতে বরের সঙ্গে আলোচনাও করে খুব।

মৃগাঙ্ক যদি এমন মহৎ না হতেন, মৃগাঙ্ক যদি এমন ধর্ম্মনিষ্ঠ না হতেন, কী হতো অতসীর দশা?

সুরেশের মৃত্যুর পর অতসীর প্রতি মৃগাঙ্কর যে ভাব জেগেছিল, সে শুধু নারীরূপের মোহ? শুধুই বেওয়ারিশ একটা মানুষের প্রতি উচ্ছৃঙ্খল লুব্ধতা?

তা যদি হত, বিবাহের সম্মান দিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে আসতেন? কী দরকার ছিল? তা না দিয়েও, ঘরে ঢোকবার অধিকার না দিয়েও, সেই মালিকহীন রূপবতীকে উপভোগ করবার বাধাটা কোথায় ছিল, যদি অভাবগ্রস্ত এবং মোহগ্রস্ত অতসী আত্মসমর্পণ করে বসতো?

বাধা সমাজও দিত না, আইনও দিত না। পুরুষের এ দুর্বলতা গ্রাহ্যের চক্ষেই আনত না কেউ।

অতসীকে? তা হয়তো সবাই ছিছিক্কার করতো, কিন্তু তাছাড়া আর তো কিছু করতো না!

মৃগাঙ্ক না দেখলে সুরেশ রায়ের আত্মীয় সমাজ ডেকে শুধোতো কি তাকে, "হ্যাঁ গো এখন তোমার কি ভাবে চলবে?" বলতো কি, "সীতুকে মানুষ করে তুলবে কি করে?"

ভাড়া দিতে না পারলে বাড়ীওলা যদি তাড়িয়ে দিত? সীতুর হাত ধরে অতসী কারও বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে সে কি দরজা খুলে ধরতো?

না, মানবিকতার প্রশ্ন নিয়ে কেউ এগিয়ে আসতো না। নেহাৎ যদি অতসী মান অপমানের মাথা খেয়ে কারুর পায়ে গিয়ে কেঁদে পড়তো, চক্ষুলজ্জার দায়ে সে হয়তো দিত এতটুকু ঠাঁই, একমুঠো ভাত, কিন্তু প্রতিদিন দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে সে অন্নের ঋণ শোধ করতে হতো।

নিষ্পরের বাড়ীর দাসত্বে মাইনে আছে, মর্যাদা আছে। আত্মীয়জনের বাড়ীর দাসত্বে দুটোর একটাও নেই। উল্টে আছে গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, অবমাননা।

দুঃখে পড়ে আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় নেওয়ার চাইতে বড় দুঃখ বোধকরি জগতে দ্বিতীয় নেই।

বেশ করেছে অতসী, ঠিক করেছে।

দুজনেই বলেছিল ওরা—শ্যামলী আর শ্যামলীর বর, "ঠিক করেছেন কাকীমা।"

বলেছিল, "ছেলেটাকে পথের ভিখিরি হবার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন উনি।"

"তাছাড়া ভালবাসারও একটা মর্যাদা দিতে হয় বৈ কি", বলেছিল শ্যামলী। "ইনি, মানে ডাক্তারবাবু, কাকীমাকে সত্যিকার স্নেহের চক্ষে, ভালবাসার চক্ষে দেখেছিলেন।"

"তাতো সত্যি", বলেছিল তার বর, "নইলে আর বিবাহের মর্যাদা দেন?" আরও বলেছিল সে সীতুকে লক্ষ্য করে "লাকী বয়! ধর, তোমার কাকীমার যদি শুধু ওই মেয়েই থাকে, আর ছেলে না হয়, ওই অত সম্পত্তি, সব কিছুর মালিক তোমাদের সীতু। আর হয়ও যদি, বেশ কিছু তো পাবেই।"

কাজেই লাকী বয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত-চিত্ত শ্যামলী সীতুর এই সহসা উগ্র হয়ে ওঠা রূঢ়তায় বিস্মিত না হয়ে, হেসে উঠে বলে, "কি হল? হঠাৎ এত রাগ কিসের সীতুবাবুর?"

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে সীতু, অতসীর অবিচলিত অম্লান মুখ থেকে সহসা উত্তর উচ্চারিত হচ্ছে, "আরে দেখনা, ওর পেটব্যথা করছে, ওষুধ খেয়ে কমেনি, তাই অত মেজাজ! সেই থেকে পড়ে পড়ে ছটফট করছিল—"

"ওমা তাই বুঝি!" হি হি করে হেসে ওঠে শ্যামলা, "সত্যিই তো বাপু, মেজাজ তো হতেই পারে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!"

মায়ের ওই অবিচলিত মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় বলেই কি সীতু আর কথা বলতে পারে না?

"মেয়েটি কে গো বৌদিদি?"

বামুন-মেয়ের উগ্র কৌতূহল আর বাঁধ মানে না, মনিবানীর ভ্রূভঙ্গীর ভয়েও না। সে কৌতূহল উক্ত প্রশ্নের আকারে এসে আছড়ে পড়ে অতসীর কাছে।

অতসী ভ্রূভঙ্গী করে।

বলে, "কোন মেয়েটি?"

"ওই যে কেবলই আসে যায়, দাদাবাবুকে অসুখ ছেলে এনে দেখায়, এইতো আজও এসেছিল—"

"আমার ভাইঝি।"

গম্ভীর কণ্ঠে বলে অতসী।

"ভাইঝি!" বামুন-মেয়ের বিস্ময় যেন আকাশে ওঠে। "ভাইঝি যদি তো, তোমায় কাকীমা বলে কেন গো?"

"বলে, ওর বলতে ভাল লাগে।" অতসী কঠিন মুখে বলে, "কে কাকে কি বলে ডাকে, তা নিয়ে তোমার এত মাথা ঘামানোর কি আছে?"

"ওমা শোন কথা! মাথা ঘামানো আবার কি? ডাকটা কানে বাজলো তাই বলেছি। দেখিনি তো ওকে কখনো এর আগে। আমি তো আজকের নই, কত কালের। তোমার শাশুড়ীর আমল থেকে আছি। এদের যে যেখানে আছে সবাইকে জানি চিনি।" সগর্বে ঘোষণা করে বামুন-মেয়ে।

"ভালই তো!" বলে চলে যায় অতসী, আর মনে ভাবে ঠিক এই কারণেই তোমাকে আগে বিদায় করা দরকার। আমার সমস্ত নিশ্চিন্ততার ওপর কাঁটার প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমায় দেব না আমি।

কিন্তু 'দেব না' বললেই তো চলেনা। পুরনো হয়ে দাঁড়ালে কাঁটাগাছেরও মাটির ওপর একটা স্বত্ব জন্মায়, শিকড়ের বন্ধন জোরালো হয়। তাকে উৎপাটিত করতে অনেক শক্তি লাগে।

কারণ তো একটা থাকা চাই? অনেক দিনের শিকড়কে উৎপাটিত করবার উপযুক্ত কারণ সুরেশ রায়ের ভাইঝির পরিচয় চেয়েছিল সে, এই অপরাধে বরখাস্ত করা যায়?

নিতান্ত বুদ্ধিসম্পন্নরাও মাঝে মাঝে বোকা হয়ে যায়, এ দৃষ্টান্ত আছে। অতসীর আজকের কাজটা সেই দৃষ্টান্তে একটা নতুন সংযোজন। নইলে কি দরকার ছিল ওর মৃগাঙ্কর সামনে শ্যামলীর আনা সেই প্রকাণ্ড মিষ্টির বাক্সটা নিয়ে আসা? খেতে বসেছিল মৃগাঙ্ক, অতসী বাক্সটা টেবিলে নামিয়ে চামচ করে সন্দেশ তুলে পাতে দিতেই মৃগাঙ্ক বলে ওঠেন, "এত সন্দেশ! কেউ তত্ত্ব টত্ত্ব পাঠিয়েছে না কি?"

"তত্ত্ব নয়," অতসী মৃদুস্বরে বলে, "শ্যামলীর ছেলের অসুখ সেরে গেছে বলে আহ্লাদ করে"—

"শ্যামলী কে?" ভুরু কুঁচকে বলে ওঠেন মৃগাঙ্ক।

"শ্যামলী!" অতসী থতমত খেয়ে বলে "শ্যামলী, মানে সেই মেয়েটি যার ছেলের অসুখে তুমি—"

থেমে গেল অতসী। দেখল মৃগাঙ্কর ভুরুটা আরো বেশী কুঁচকে উঠেছে, হাতের আঙ্গুল কটা উঠেছে কঠিন হয়ে, সেই কঠিন আঙ্গুলের ডগা দিয়ে সন্দেশ দুটো ঠেলে রাখছে থালার কোণে। মুহূর্তে সহসা কঠিন হয়ে উঠল অতসীও। যে স্বরে কখনো কথা বলে না সেই স্বরে বলল, "খাবে না?"

মৃগাঙ্ক গম্ভীর স্বরে বলেন, "না।"

অতসীরও বুঝি সীতুর হাওয়া লেগেছে, জেগেছে বুনো গোঁ, তা নয়তো অমন জিদের স্বরে বলে কেন, "না খাবার কারণ?"

"ইচ্ছে নেই।"

"কেন ইচ্ছে নেই বলতে হবে।"

"বলতেই হবে?"

বিদ্রূপে তিক্ত শোনাল মৃগাঙ্কর কণ্ঠ।

আশ্চর্য! এই সেদিন না মৃগাঙ্ক ডাক্তার মনকে উদার করার দীক্ষা নিচ্ছিলেন? মন্ত্রপাঠ করেছিলেন সহনশীলতার? ভাবছিলেন, অতসীর যে একটা অতীত আছে, সেটা ভুলে গেলে চলবে কেন? অথচ কিছুতেই তো সামান্য ওই বাটাছানার মিহি সন্দেশ দুটো থালাধঃকরণ করতে পারলেন না। তিক্তকণ্ঠে বললেন, "বলতেই হবে?"

"হ্যাঁ বলতেই হবে।" স্বভাব-বহির্ভূত জেদি সুরে রুক্ষ নির্দেশ দেয় অতসী, "বলতেই হবে, বাধা কিসের? প্রতিবেশীর ঘর থেকে মিষ্টি দিলে লোকে খায় না?"

"প্রতিবেশী! ও হ্যাঁ, নতুন একটা পয়েন্ট আবিষ্কার করেছ দেখছি। কিন্তু প্রতিবেশীর পরিচয় বহন করেই কি সে এখানে এসেছিল?"

"ঠিক কথা, তা সে আসেনি। কিন্তু যে পরিচয়েই আসুক, তার অপরাধটা কোথায় জানতে পারি কি?"

মৃগাঙ্ক মোহনের কি সামলে যাওয়া উচিত ছিল না? ভাবা উচিত ছিল না, অতসী তো কই কখনো এমন করে না? সত্যি স্ত্রীর অধিকারে তর্কাতর্কি জেদাজেদি, অথবা ঔদ্ধত্যপ্রকাশ, এ কবে করেছে অতসী? হয় নিজেকে লুকিয়ে রাখা কুণ্ঠিত মৃদু ভাব, নয়তো বিগলিত অভিভূত কৃতজ্ঞতা। অতসীর আজকের এ রূপ নতুন, অপরিচিত। তবু তো কই নিজেকে সামলালেন না মৃগাঙ্ক, বরং যেন আগুনে ইন্ধন দিলেন। বলে উঠলেন, "অপরাধ কারুর কোথাও নেই অতসী, অপরাধী আমিই। সুরেশ রায়ের আত্মীয়ের হাতের সন্দেশ খাবার রুচি আমার নেই।"

স্পষ্ট স্বীকারোক্তি!

বোধকরি এতটা স্পষ্টতা আশা করে নি অতসী, তাই স্তব্ধ হয়ে গেল সে, সাদা হয়ে গেল মুখ। তারপর আস্তে আস্তে আরক্ত হয়ে উঠল সে মুখ। তারপর কথা কইল আস্তে আস্তে। বলল "এক সময় আমিও ওই নামের লোকেরই আত্মীয় ছিলাম।"

মৃগাঙ্ক এবার বোধকরি একটু সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন, "বৃথা উত্তেজিত হচ্ছো কেন? কারণটা যখন সামান্য। এই সন্দেশটা খেলাম কি না খেলাম, কি এসে গেল তাতে?"

"প্রশ্নটা সন্দেশ খাওয়ার নয়", স্থির স্বরে বলে অতসী, "প্রশ্নটা হচ্ছে রুচি না হওয়ার। প্রশ্ন হচ্ছে সহ্য করতে পারা না পারার। সাদাসিধে হাসিখুসি কমবয়সী একটা মেয়ে এক আধবার তোমার বাড়ীতে বেড়াতে আসে, সেটুকু সহ্য করবার মত উদারতা তুমি খুঁজে পাচ্ছনা দেখতে পাচ্ছি।"

মৃগাঙ্ক আবার যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠেন, "সেটা দেখতে পাচ্ছ অতসী, কারণ মন তোমার আচ্ছন্ন হয়ে আছে সন্দেহে আর অভিমানে। তবু জিজ্ঞেস করি. যদিই হয়ে থাকে, এই সঙ্কীর্ণতা কি খুব অস্বাভাবিক?"

"অন্ততঃ যে কোন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিকও নয়। তুমি কি জানতে না আমার একটা অতীত আছে, আর জীবনের ছাব্বিশ সাতাশটা বছর ধরে আমি সমাজ সংসারের বাইরেও কাটাইনি? আমার সেই জীবনে কারুর ওপর একটু স্নেহ জন্মাবে না এটাই বা হবে কেন?"

মৃগাঙ্কর খাওয়া শেষ হয়েছিল, তিনি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "আমি তো

বলিনি অতসী, 'হবে না,' 'হওয়া উচিত নয়,' 'হওয়া অস্বাভাবিক'? তুমি যাকে খুসি এবং যত খুসি স্নেহ করে বেড়াওনা, আমি তো আপত্তি করতে যাচ্ছি না। শুধু এইটুকু চাইছি, আমাকে তার মধ্যে জড়াবার চেষ্টা না কর।"

অতসী কী আজ ক্ষেপে গেছে?

ও কি মস্তবড় একটা বোঝাপড়া করতে চায়—শুধু মৃগাঙ্কর সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গেও? নইলে এমন করে কথা কাটাকাটি করছে সে কি করে? এতগুলো বছরের মধ্যে অতসী মৃগাঙ্কর মুখের উপর একটি উঁচু কথা কয় নি।

আজ শুধু কথাই উঁচু নয়, গলাও উঁচু অতসীর।

"তাই বা চেষ্টা করব না কেন? আমি যদি তোমার পরিচিত সমাজ থেকে নির্লিপ্ত থাকতে চাই? তোমার প্রীতিকর হবে সেই অবস্থাটা?"

মৃগাঙ্ক একটু ভুরু কোঁচকালেন, তারপর ঈষৎ ব্যঙ্গে বললেন, "হয়তো হবে না। তবু এটাই স্বীকার করে নেব, জীবনে সব কিছুই প্রীতিকর জোটে না।"

'ওঃ তাই!" অতসী সহসা খুব শান্ত গলায় বলে, "তাই এই নীতিতেই তাহলে সীতুকে মেনে নিয়েছিলে তুমি? তোমার অগাধ অসীম উদারতায় নয়?"

এবার বুঝি স্তব্ধ হবার পালা মৃগাঙ্ক মোহনের।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলেন, "নিজেকে আমি মস্ত এক উদার ব্যক্তি বলে কোনদিনই প্রচার করে বেড়াইনি অতসী!"

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান মৃগাঙ্ক ডাক্তার।

আর অতসী কাঠের মত বসে থাকে সেই খাবার টেবিলেরই ধারের একটা চেয়ারে। এখানে যে এখুনি চাকর বাকর এসে পড়বে, সে খেয়াল থাকে না তার।

এ কী করলো সে?

এ কী করলো?

কেঁচো খুঁড়তে, সাপ তুলে বসলো?

মৃগাঙ্ককে ছোট করতে গিয়েছিল সে? ছি ছি ছি! তা করতে গিয়ে কত ছোট হয়ে গেল নিজে!

মৃগাঙ্ক স্তব্ধ হয়ে গেল!

যাবেই তো।

সীমাহীন স্পর্দ্ধা আর সীমাহীন অকৃতজ্ঞতা, মানুষকে মূক করে দেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে?

ডাক্তার মৃগাঙ্ক মোহনের সময় নেই অতসীর মত মন রোমন্থন করবার। তবু আজ

আর গাড়ীর ষ্টিয়ারিঙ্ নিজের হাতে নিলেন না তিনি, ড্রাইভারের হাতে ছেড়ে দিয়ে পিছনে বসলেন হেলান দিয়ে, ভাবতে লাগলেন অতসীর অভিযোগ কি ভিত্তিহীন ?

সত্যি বটে, সীতুর অসভ্যতা তাঁকে এত পীড়িত করে যে, কিছুতেই তার প্রতি মনকে প্রসন্ন করে তুলতে পারেন না, কিন্তু ওই মেয়েটা ? ওর প্রতি অপ্রসন্নতা আসতে পারে এমন কোন ব্যবহার তো ও করেনি ? খুব একটা কুৎসিত কুরূপ, অমার্জিত কি অভব্য, এমনও নয়। সত্যিই অতসী যা বলেছে, সাদাসিধে সরল হাসি খুসি মেয়ে !

তবু—

তবু ওকে দেখলে বিরক্তিতে মন বিষিয়ে ওঠে কেন মৃগাঙ্কর ?

কেবলমাত্র সুরেশ রায়ের সম্পর্কিত বলেই তো ? অতসীর দেওয়া অপবাদ কি তাহলে মিথ্যা ?

অনেকবার চেষ্টা করলেন মৃগাঙ্ক সেই মেয়েটার প্রতি মনকে সহজ করেছেন এই অবস্থাটা কল্পনা করতে। ভাবলেন সহাস্যে তাকে বলছেন, "খুব তো সন্দেশ খেলাম, ছেলে কেমন আছে ? আর কোন অসুবিধা নেই তো ?" পারলেন না, কল্পনা করতেই মনটা বিস্বাদ বোদা হয়ে উঠল !

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ নিজের কাছে স্বীকার করলেন মৃগাঙ্ক, জীবনের এই জটিলতার জাল থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। হতে গেলে—অতসীর ভাষায় যে 'অসীম অগাধ উদারতা' থাকা প্রয়োজন, তা অন্ততঃ মৃগাঙ্কর নেই।

কিন্তু কারোরই কি থাকে ?

এ রকম ক্ষেত্রে ?

যে বস্তু অসহনীয় তাকে মন থেকে সহ্য করতে কে পারে ?

সপত্নী সম্পর্কটা সহ্য করবার বস্তু নয়।

অনেকদিন পরে এক বন্ধুর বাড়ী গেলেন মৃগাঙ্ক।

কলেজের বন্ধু সতীনাথ।

বিশেষ করে এই বন্ধুর বাড়ী যাবার একটু তাৎপর্য্য আছে। বন্ধুটি কিছু বছর হলো বিপত্নীকের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন, ছিলেন কিছুদিন সে খাতায়। কিন্তু বছর দুই হ'ল আবার সেখান থেকে নাম খারিজ করে নিয়েছেন, আবার সগৌরবে 'সস্ত্রীক' বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, আত্মীয়জনের বাড়ীর কাজকর্মে 'স-পরিবারে' নেমন্তন্ন খেয়ে আসছেন।

দ্বিতীয়বার মস্তক মুণ্ডনের সময়ও বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন করেছিল সতীনাথ, মৃগাঙ্ক ইচ্ছে করেই যান নি। অথবা যেতে ইচ্ছে হয় নি।

এতদিন বিপত্নীক অবস্থায় কাটিয়ে, বছর আড়াইয়ের মেয়েটাকে আট দশ বছরের করে

তুলে, তারপর আবার বিয়ে করা, খুব খেলোমি ঠেকেছিল মৃগাঙ্কর। তদবধি বড় একটা দেখা সাক্ষাৎও হয়নি। সময় হয়নি, কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে সভ্য শহুরে লোকগুলোর যে মরবারও সময় থাকে না।

বন্ধুর বাড়ী গিয়ে আড্ডা দেওয়া?

স্বাদ ভুলে গেছে লোকে সেই পরম রমণীয়তার।

বিনা উদ্দেশ্যে বন্ধুর বাড়ীতেও আর যায় না কেউ। যায় না মানে যেতে পারে না। সময় হয় না।

মৃগাঙ্ক ডাক্তার আজ বার করলেন সময়।

কাজের থেকে চুরি করে নিলেন খানিকটা সময়।

কিন্তু মৃগাঙ্কই কি বন্ধুর বাড়ী গেলেন বিনা উদ্দেশ্যে?

যদিও বন্ধুর জীবনটা মৃগাঙ্কর নিজের জীবনের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত, তবু ইচ্ছে হল মৃগাঙ্কর একবার বন্ধুর ওই বিড়ম্বনাময় জীবনটা দেখে আসেন। দেখেন তারা নিজেদেরকে কোন অবস্থায় রাখতে পেরেছে?

না, বিড়ম্বনাময় ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলেন না মৃগাঙ্ক।

সতীনাথ হৈ হৈ করে ওঠেন, "আরে, আরে, এসো এসো! ব্যাপারটা কি? তোমার দর্শন?"

মৃগাঙ্ক ধীরে সুস্থে আসন গ্রহণ করে বললেন, 'দর্শনটা নিতান্তই যখন দুর্লভ হয়ে ওঠে, তখন এক পক্ষকে এগিয়ে আসতেই হয়।"

"খুব যা হোক নিলে এক হাত!" বললেন সতীনাথ, "অবিশ্যি নেবার অধিকার তোমার আছে। বাস্তবিকই ভারী কুড়ে হয়ে গেছি, কোথাও আর যেয়ে উঠতে পারি না।'

"বৃদ্ধস্য তরুণী হলে যা হয়!" বললেন মৃগাঙ্ক মৃদু হেসে।

"যা বল ভাই। বলে নাও যত পারো। তারপর তোমার খবর কি?'

"ভালই!" বললেন মৃগাঙ্ক।

এই নিরুত্তাপ 'ভালই'য়ের পর কথাটা যেন স্রোত হারিয়ে থেমে গেল। থেমে যে গেল তার প্রমাণ পাওয়া গেল সতীনাথের পরবর্তী কথায়—"কি রকম গরম পড়েছে দেখেছ?"

"দেখছি, খুব পড়েছে।"

গরম হয়তো সত্যিই বেশী পড়েছে। কিন্তু সেটা কখনই দুই বন্ধুর আলোচ্য বিষয় হতে পারে না, যদি না তাদের কথার ভাঁড়ার ফাঁকা থাকে।

"বোসো একটু চায়ের কথা বলি," বলে সতীনাথ উঠলেন, দরজার কাছে গিয়ে হাঁক পাড়লেন, "ঠাকুর!"

মৃগাঙ্ক বাধা দিলেন, "এই শোন, মিথ্যে কেন চেঁচামেচি করছো, জানোই তো আমি রোগীর বাড়ীর পোষাকে কিছু খাই না"

"ও হো হো তাও তো বটে! তা' এখনও সে অভ্যাসটি বজায় রেখেছ? এ যুগে তো কেউই ওসব শুদ্ধাচারের বিধি নিষেধ মানে না হে!"

"শুদ্ধাচার বলতে কি বোঝায় জানি না সতী, আচার যদি বল তো বলতে পারি ডাক্তারের ছুঁৎমার্গ হচ্ছে বুদ্ধিমানের আচার। স্বাস্থ্যবিধির বিধি নিষেধ কোন যুগেই অচল হয়ে যায় না, ওটা চিরযুগের।"

"তোমার এ কথাটি মানতে পারলাম না ভাই" বললেন সতীনাথ, "বিধি নিষেধেরও ধারা পালটায়। সমাজরক্ষার মতই স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিও নিত্য বদলাচ্ছে। পুরোপুরি কাঠামোটাই বদলাচ্ছে। দেখ, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখেছি জ্বরবিকারের রুগীকে এক ফোঁটা জল খেতে দেওয়া হ'ত না, ঘরের জানলা খোলবার জো নেই, গায়ে কম্বল চাপা, আর এখন? তেমন রুগীকে জল খাইয়েই রেখে দিচ্ছ তোমরা, গায়ে ঢাকা দেবার দরকার বোধ কর না, আর জানলা খোলা ছেড়ে খোলা বারান্দায় শুইয়ে রাখতেও বোধ হয় আপত্তি নেই। এ তো একটা মাত্র উদাহরণ, কি জ্বরে, কি শূল বেদনায়, কি শিশু পালনে, কি প্রসূতি পরিচর্যায়, আগের থিয়োরি তো কিছুই নেই। বল, আছে?"

"তা নেই বটে?" হাসলেন মৃগাঙ্ক, "তবে আক্ষেপেরও কিছু নেই।"

"আক্ষেপের কথা হচ্ছে না। আমি বলছি, একসময় ভাল ভাল পাশ করা ডাক্তাররাও তো সেই পদ্ধতিতে চলে এসেছে, আজ যে পদ্ধতিকে তোমরা সেকেলে বলছ। সেই পদ্ধতিতেই চলে 'হাত যশ' দেখিয়েছে, বিখ্যাত হয়েছে, অথচ আজ তোমরা তাদের অজ্ঞতার কথা ভেবে কৃপা করছ তাদের। পরবর্তীকাল আবার তোমাদের অজ্ঞতায় হাসবে।"

মৃগাঙ্ক মোহন হেসে উঠে বলেন, "তা' এসব তো জানা কথা, এখন আসলে তোমার বক্তব্যটা কি?'

"বক্তব্য কিছুই নয়, শুধু বলছি আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাও ওইভাবে দ্রুত বদলাচ্ছে, কিন্তু এর শেষ কোথায় জানো?"

"না তা' জানি না।" আবার হাসেন মৃগাঙ্ক।

"শেষ হচ্ছে—সতীনাথ প্রায় উত্তেজিত ভাবে বলেন, "আবার সেই আদিমকালের মাতৃতন্ত্র। আমি বলছি মৃগাঙ্ক, সেদিনের খুব বেশী দিন নেই, যেদিন আবার ফিরে আসবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ।"

"হঠাৎ এত বড় ভবিষ্যৎ বাণী?"

"যা দেখছি ভাই! কেন তুমি দেখতে পাচ্ছ না, 'বাড়ীর কর্ত্তা' বলে শব্দটা স্রেফ্ উঠে

গেছে। গিন্নীরাই সব, গিন্নীদেরই সমস্ত, গিন্নীর অঙ্গুলি নির্দেশে সারা সংসার চলছে। গিন্নীর কাজের প্রতিবাদ করেছ কি আগুন জলেছে! দেখছ না? টের পাচ্ছ না?"

এতক্ষণে বুঝতে পারেন মৃগাঙ্ক আসল ব্যথাটা সতীনাথের কোথায়। মৃদু হেসে বলেন, "তোমার মতন অতটা টের বোধহয় পাচ্ছি না"

"তা হলে বুঝতে হবে তুমি ভাগ্যবান ব্যক্তি! তোমার গৃহিনী এ যুগের ব্যতিক্রম। আমার অবস্থা বুঝতেই পারছ, বন্ধু এসেছে, বামুনঠাকুরকে ডাকছি চা বানাতে। গৃহিনী হাওয়া! কখন বেরোন কখন ফেরেন, কতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন কিচ্ছু জানি না। অনুগ্রহ করে যখন দেখা দেন কৃতার্থ হয়ে যাই। জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না—গিছলে কোথায়? আমার পোষ্ট হচ্ছে ব্যাঙ্কের। টাকা দরকার হলেই শুধু আমি।"

মৃগাঙ্ক বলেন, "তবে আবার কি, ওই তো যথেষ্ট। অর্থনৈতিক পরাধীনতা না আসা পর্যন্ত পুরুষসমাজ টিকে থাকবেই কোন রকমে। তাছাড়া—"

"আরে ভাই তাও তো যেতে বসেছে। আমার না হোক, পাড়ার অনেকের স্ত্রীই তো চাকরি-বাকরী করছে। আর দু'দিন বাদে বলবে তোমার ভাত আর খাব না।"

বন্ধুর সামনে গম্ভীর মৃগাঙ্ক সহসা বুঝি একটু তরল হয়ে ওঠেন, হেসে বলেন, "তাতেও চিন্তার কিছু নেই সতীনাথ, এমন দিন যদি আসে মেয়েরা একযোগে বলছে 'তোমাদের ঘরে আর শোবনা,' তবেই বুঝবে পুরুষের যথার্থ দুর্দিন এল। কিন্তু সে কথা আর ক'জন বলবে বল, ক'দিনই বা বলতে পারবে? আমাদের দেহবিজ্ঞান বলছে দেহাতীত হবার শক্তিতে মেয়ে পুরুষ দু'জনেই সমান কাঁচা। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষ ব্যতিক্রম আছেই। কিন্তু সংসার যদি কর্তাপ্রধান না হয়ে গৃহিনীপ্রধানই হয়—ক্ষতি কি? তাঁরাই তো সংসার। তাঁদের জন্যেই তো সংসার।"

"ওহে বাপু, নিজে ভুক্তভোগী নয় বলেই বলতে পারছ এ কথা। যখন জুলজুল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হয় তোমার সংসারে তোমার কোন অধিকার নেই, তখন—"

"এক সময় আমাদের সমাজে মেয়েদের তো এই অবস্থাই ছিল সতীনাথ, আজ না হয় পুরুষের হ'ল।"

"বলা সোজা মৃগাঙ্ক"—সতীনাথ উত্তেজিত ভাবে বলেন, 'তোমার স্ত্রী যদি তোমার বিনা অনুমতিতে, তোমার সঙ্গে পরামর্শ মাত্র না করে, তোমার ছেলেটাকে বোর্ডিঙে দিয়ে আসে, আর কেবলমাত্র পাড়ায় চেঁচামেচি লোক জানাজানির ভয়ে তোমাকে সেই অত্যাচার সহ্য করতে হয়, বলতে পারবে এ কথা?"

মৃগাঙ্ক আর একবার বুঝলেন সতীনাথের যন্ত্রণাটা কোথায়। লোকটা চিরকালই হাসি খুসি স্ফূর্তিবাজ, তাই চট করে বোঝা যায় নি।

আর হাসলেন না, মৃদুস্বরে বললেন—"আমার পক্ষে ঠিক এ রকমটা বোঝার একটু অসুবিধে আছে সতী, কারণ আমার বাড়ীর ছেলেটা আমার ছেলে নয়। তুমি যে

অবস্থাটার বর্ণনা করলে, আমি হয়তো তেমন অবস্থায় পড়লে বেঁচেই যাই কিন্তু তা হবার আশা নেই। আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। স্বাধীন ভাবে কিছু করা যায়, এ তিনি যেন ভাবতেই পারেন না।"

"আবার বলব ভাই তুমি ভাগ্যবান! স্বাধীনা স্ত্রী নিয়ে আমার—" হঠাৎ গলাটা বুজে এল সতীনাথের, একটু পরে গলা ঝেড়ে মৃদুস্বরে বললেন, "বিশ্বাস করতে পারো, আমাকে না বলা না কওয়া, আমার মেয়েটাকে, আমার একলার মেয়েটাকে—বোর্ডিঙে ভর্তি করে দিয়েছে!"

মৃগাঙ্ক তীব্র বিদ্রূপে বলে ওঠেন, 'দিয়েছেন, খুব ভালই করেছেন, কিন্তু তুমি সেটা মেনেও তো নিয়েছ দেখতে পাচ্ছি।"

"কী করবো বল ভাই, করবার আছে কি? যা খুসি তাই করে ও, আর ওর বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা দিতে—নিজের কানে শুনেছি আমি, বাহাদুরী করে বলে বেড়ায় "পুরুষমানুষ কোথায় জব্দ জানিস, কেলেঙ্কারীর ভয়ের কাছে। তাই কেয়ার করি না আমি ওকে, মারতে তো পারবে না, আমাদের পিতামহী প্রপিতামহীদের আমলের মত? তবে আর ভয়টা কি?" বোঝ ভাই, যে মেয়েমানুষ এমন কথা বলতে পারে, তাকে কী করা যায়?"

"মারাই যায়!" আরও তীব্রস্বরে বলে ওঠেন মৃগাঙ্ক, "আমাদের সেই চলতি কথাটা ভুলে গেছ সতীনাথ? 'হাতে না মেরে ভাতে মারা'! তুমি ওঁর সঙ্গে সমস্ত সহযোগিতা ত্যাগ করে অপরিচিতের মত থাকতে পারো। দেখ কাকে কার আগে প্রয়োজন হয়।'

'সে কি আর হয়?" সতীনাথ ক্ষুণ্ণভাবে বলেন, "সমাজে সংসারে বাস করে তা চলে না!"

"না চলবার কী আছে? এ তো ঠাণ্ডা লড়াই।"

"ঠাণ্ডাই ঠাণ্ডা হয়ে ওঠেরে ভাই! আত্মবন্ধুকে জবাবদিহি করতে হবে না? আমার পারিবারিক জীবনের ওপর সমাজের সহস্র চক্ষু তীব্র হয়ে নেই?"

"বেশ তো, তেমন প্রশ্ন ওঠে, স্পষ্টই বলবে স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনে না।" রায় দেওয়ার ভঙ্গীতে—কথা শেষ করে একটা সিগারেট ধরান মৃগাঙ্ক। সতীনাথ ধূমপায়ী নয়, তাই একাই ধরান।

সতীনাথ মিনিট খানেক সেই অলস ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, "ওইখানেই তো মেরে রেখেছে ভাই! 'স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনে না' এতবড় লজ্জার কথা কি উচ্চারণ করা সহজ? ওর থেকে অগৌরব আর কি আছে? লোকের কাছে ওই মাথা হেঁট হবার ভয়ই এত সহ্য করতে বাধ্য করাচ্ছে। সুখ নেই, শান্তি নেই, অন্তরঙ্গতা নেই, ষ্টেজের থিয়েটারের মত প্রতিনিয়ত শুধু প্লে করে চলেছি!"

সতীনাথের ভাষা সাদা-মাটা, কিন্তু ভাবটা মৃগাঙ্কর হৃদয়কে স্পর্শ করে। না, একেবারে উড়িয়ে দিতে তিনি পারেন না বন্ধুর মর্মকথা। এ তো একা সতীনাথের জীবনের অভিশাপ নয়, এ হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ।

কিন্তু প্রশ্ন করবারই বা কি আছে? সীতু যে পাগল নয় এ প্রমাণ তো দিচ্ছে না। পাগলের মতই তো করছে সীতু। বিছানায় মাথা ঘসড়াচ্ছে, আর বলছে, "না তুমি মিথ্যে কথা বলছো। আমার বাবা মরে গেছে। আমি এখানে থাকব না, আমি চলে যাব, আমি মরে যাব।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে থাকতে হবে না এখানে", অতসী তেমনি হতাশ কণ্ঠে বলে, "তোমার অন্য ব্যবস্থা করবো। শুধু যে কটা দিন তা না হচ্ছে, একটু শান্তিতে থাকতে দাও আমায়।"

"না না" পাগলের মতই গোঁ গোঁ করছে সীতু, 'আমি এক্ষুনি চলে যাব। আমি এক্ষুনি চলে যাব।"

"চলে যাবি! আমার জন্যে তোর মন কেমন করবে না?"

"না না না। তুমি খুকুর মা, তুমি এদের বাড়ীর লোক।"

অতসী এবার দপ্ করে জলে উঠে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "রোসো, সত্যিই তোমাকে বোর্ডিঙে রাখবার ব্যবস্থা করছি আমি।"

"বলছি তো আমি এক্ষুনি চলে যাব।"

'যা তবে। কোন চুলোয় তোর সেই পূর্বজন্মের বাড়ি আছে, যা সেখানে। হবেই তো, এর চাইতে ভাল বুদ্ধি আর হবে কোথা থেকে? কৃতজ্ঞতা কি তোদের হাড়ে আছে? বলছি যত শীগগির পারি তোমায় বোর্ডিঙে দেব, আজ এক্ষুনি সেটা শুধু সম্ভব নয়। একটা দিন আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

"তুমি কেন মিথ্যে কথা বলেছিলে? কেন বলেছিলে ওটা আমার বাবা?"

'বেশ করেছি বলেছি।' একফোঁটা একটা ছেলের কাছে আর হারতে পারে না অতসী। নিষ্ঠুরতার চরম করবে সে। তাই ঝাঁজালো গলায় তেতো স্বরে বলে ওঠে, 'কি করবি তুই আমার? এখানে যদি না আসতিস, খেতে পেতিস না, পরতে পেতিস না, বাড়িওলা দূর দূর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতো, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে হতো বুঝলি? যে মানুষটা এত যত্ন করে মাথায় করে নিয়ে এল, তাকে তুই—উঃ এই জন্যেই বলে দুধকলা দিয়ে সাপ পুষতে নেই!'

'মেরে ফেল, মেরে ফেল আমাকে।'

'মেরে তোকে ফেলব কেন, নিজেকেই ফেলবো।' অতসী গম্ভীর ভাবে বলে, 'সেইটাই হবে তোর উপযুক্ত শাস্তি।'

"কাকীমা!"

দরজার বাইরে থেকে ধ্বনিত হ'ল এই পরিচিত কণ্ঠটি। হ'ল বেশ শান্তকোমল স্বরেই,

কিন্তু সে স্বর অতসীর শুধু কানেই নয়, বুকের মধ্যে পর্যন্ত ঝনাৎ করে গিয়ে লাগল। লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাত পা শিথিল হয়ে এল তার।

এ কী!

এ কী বিপদ! বেড়াতে আসার আর সময় পেল না শ্যামলী? এই যে ছেলেটা খাটের ওপর মুখগুঁজে গড়াগড়ি খাচ্ছে, এ দৃশ্য তো শ্যামলী এখনি এসে দেখে ফেলবে। কী কৈফিয়ৎ দেবে অতসী তার? শ্যামলী কি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাবে না? ভাববে না কি কোথাও কোন ঘাটতি ঘটেছে? তাছাড়া সীতু ওকে দেখে আরও গোঁয়ার্তুমি, আরও বুনোমি করবে কি না, কে বলতে পারে? হয়তো ইচ্ছে করে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে যে অবস্থাকে কিছুতেই আয়ত্তে এনে সভ্য চেহারা দেওয়া যাবে না।

"কাকীমা আসছি।" পর্দায় হাত লাগিয়েছে শ্যামলী। মুহূর্তে সমস্ত ঝড় সংহত করে নিয়ে সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা বলে ওঠে অতসী, "আয় আয়, বাইরে থেকে ডেকে পারমিশান নিয়ে—এত ফ্যাসান শিখলি কবে থেকে?"

শ্যামলী একমুখ হাসি আর বড় একবাক্স সন্দেশ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

নিজের খুসির ছটায় পারিপার্শ্বিকের দিকে দৃষ্টি পড়ে না শ্যামলীর, এগিয়ে এসে সন্দেশটা অতসীর দিকে বাড়িয়ে ধরে, "নিন! বাট্টুর সেরে ওঠার মিষ্টি খান!"

"কি আশ্চর্য! এসব কি শ্যামলী? না না এ ভারী অন্যায়!"

"অন্যায় মানে? অতদিন ধরে ভুগছিল ছেলেটা, আমরা তো হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কোনও ডাক্তার রোগ ধরতে পারছিল না। ডাক্তার কাকাবাবুর দু'দিনের দেখায় সেরে উঠল, এ আহ্লাদের কি শেষ আছে? নেহাৎ না কি ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করা চলে না, তাই কাকাবাবুকে একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে—"

ভারী বাক্যবাগীশ মেয়েটা।

কিন্তু দ্বিধা চিন্তা কিছু নেই, সাদাসিধে সরল। কথা যখন বলে, তাকিয়ে দেখে না তার প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে। এই জন্যেই তো সুরেশ রায়ের বংশের মধ্যে এই মেয়েটাকেই বিশেষ একটু স্নেহের চক্ষে দেখতো অতসী। সুরেশ রায়ের জ্যেঠতুতো দাদার মেয়ে। শ্যামলা রং, হাসিখুসি মুখ, গোলগাল গড়ন, বছর আষ্টেকের মেয়েটা, বিয়ের কনে অতসীর সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্রই অতসীর মন হরণ করে নিয়েছিল। শ্যামলীও কাকীমার মধ্যে যেন বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছিল।

তারপর তো অতসীর দিকে কত ঝড়, কত বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, আরও কত কি! আর শ্যামলীর দিকে প্রকৃতির অকৃপণ করুণা। স্কুলের পড়া সাঙ্গ হতে না হতেই ভাগ্যে জুটে গেছে দিব্যি খাসা বর, সংসার করছে মনের সুখে স্বাধীনতার আরাম নিয়ে। বড়লোক না হলেও অবস্থা ভাল, আর স্বামীটির প্রকৃতি অতীব ভাল। সরল, হাস্য মুখ। দুটো ছেলেমানুষে মিলে যেন খেলার সংসার পেতেছে!

বিধাতার আশ্চর্য নির্বন্ধ, সে সংসার পেতেছে অতসীরই বাড়ীর কখানা বাড়ী পরে। আগে জানত না দু'জনের একজনও, দেখা হয়ে গেল দৈবাৎ।

পাড়ার বইয়ের দোকানে সীতুকে নিয়ে তার নতুন ক্লাশের বই কিনতে গিয়েছিল অতসী, আর শ্যামলীও এসেছে ছোট ছেলের জন্যে রঙিন ছবির বই কিনতে। অসুস্থ ছেলে রেখে এসেছে ঘরে, তার মন ভোলাতে বাছাই করছে নানা রঙবেরঙের ছবি-ছড়া। ছেলে নিয়ে দোকানে উঠেই অতসী যেন পাথর হয়ে গেল!

এ কী অভাবিত বিপদ!

এই দণ্ডে কি সীতুকে টেনে নিয়ে দোকান থেকে নেমে যাবে অতসী? না কি না দেখার ভান করবে?

দুটোর কোনটাই হ'লনা, চোখোচোখি হয়ে গেছে। আর চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামলী লাফিয়ে উঠেছে, "কাকীমা!"

এরপর আর কি করে না দেখার ভান করবে অতসী? কি করে চট করে নেমে যাবে দোকান থেকে?

ফিকে হাসি হাসতেই হয়, মুখে কথা জোগাবার আগে। কিন্তু শ্যামলী ওসব ফিকে ঘোরালোর ধার ধারে না। পূর্বাপর ইতিহাস, বর্তমান পরিস্থিতি, কোন কিছুই তার উল্লাসকে রোধ করতে পারে না। দোকানের মাঝখানেই একে ওকে পাশ কাটিয়ে অতসীর গায়ে হাত ঠেকিয়ে বলে ওঠে, "ওঃ কাকীমা, কতদিন পরে! বাবাঃ!"

অতসীর প্রবল শক্তি আছে ঝড়কে মনের মধ্যে বহন করে বাইরে সহজ হবার, তবু বুঝি অবিচলিত থাকা সম্ভব হয় না। তবু বুঝি কথা কইতে ঠোঁট কাঁপে, "তুমি এখানে?"

"ওরে বাবা, আমাকে আবার তুমি! এই দুষ্টু মেয়েটাকে বুঝি ভুলেই গেছেন কাকীমা? ওসব চলবে না, 'তুই' বলুন!"

এবার অতসী সত্যিকার একটু হাসে, "বলছি। এখানে আর কি কথা হবে?"

"এখানে মানে? ছাড়বো না কি? ধরে নিয়ে যাব না? বইটই কেনা এখন থাক, চলুন চলুন। বাবাঃ, কত দিন পরে! আপনার কার জন্যে বই? ওমা সীতু না? কত বড়টি হয়ে গেছে ইস! কিন্তু সেই রকম রোগা আছে।"

কথা, কথা, কথার স্রোত একেবারে! দোকানের লোকেরা যে হাঁ করে শুনছে তাও খেয়াল নেই মেয়েটার।

শুধু ওই জন্যেই দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ে অতসী। কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলে, "তুমি এখানের দোকান থেকে কেনা কাটা কর বুঝি?"

"আবার 'তুমি!" অভ্যাস বদলান। এই দোকান থেকে কেনা কাটা করব না! এই তো পাড়া আমাদের। ওই মোড়ের মাথায় প্রকাণ্ড লালরঙা বাড়ীটা? ওখানেই একটা ফ্ল্যাটে থাকি। দোতলার ফ্ল্যাট। অত কথায় কাজ কি, চলুন।"

অতসী অনুভব করছে তার হাতের মধ্যে ধরা সীতুর হাতটা কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠেছে, চকিত দৃষ্টি ফেলে দেখছে, যাকে বলে বিস্ময় বিস্ফারিত, তেমনি দৃষ্টি ফেলে নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে আছে সীতু এই বাক্যচ্ছটাময়ীর হাসিতে উচ্ছল খুসিতে টলমল মুখটার দিকে!

অমন করে দেখছে কেন?

শুধুই অপরিচিতার প্রতি শিশু মনের কৌতূহল? না কি এমন হাসিতে উচ্ছল খুসিতে টলমল মুখ সে জীবনে কখনো দেখেনি বলে অবাক হয়ে গেছে?

নয় তো কী! নয় তো কী! মনে মনে শিউরে উঠছে অতসী, এই আকস্মিকতার সূত্র ধরে এক বিস্মৃত অতীতকে মনে পড়ে যাচ্ছে সীতুর? পরতে পরতে খুলে পড়ছে চেতনার কোনও স্তর?

এ কী বিপদ, এ কী বিপদ!

অন্যমনস্ক মেয়েটা কি শুধুই অন্যমনস্ক? ভেবেছিল সেদিন অতসী। না কি এই অজস্র কথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভয়ঙ্কর একটা ভারী জিনিসকে ঠেলে পার করে নিয়ে যেতে চায় সে? তাই অন্যমনস্কতার ভান করে এই ঢেউ দেওয়া, ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেওয়া।

শুধু কথা নয়, রাস্তার মাঝখানে প্রায় হাত ধরেই টানাটানি করেছিল সেদিন শ্যামলী অতসীকে, তবু হেসে মিনতি করে সে অনুরোধ কাটিয়ে পালিয়ে এসেছিল অতসী, আর নিতান্ত ভদ্রতার দায়ে নিতান্ত মৌখিক ভাবেই বলতে বাধ্য হয়েছিল, "বেশ তো, তুইও তো চলে আসতে পারিস!"

"ও বাবা! সে আবার বলার অপেক্ষা?" শ্যামলী হেসে উঠেছিল, "সে তো আমি না বলতেই যাবো। গিয়ে গিয়ে পাগল করে তুলবো। একবার যখন সন্ধান পেয়ে গিয়েছি।"

তা কথা রেখেছে শ্যামলী। কেবলই এসেছে। অতসী অস্বস্তি পাচ্ছে কি বিব্রত হচ্ছে, সে চিন্তা মাথায় আসেনি তার। ওকে দেখলে অতসীর মনটা স্নেহে কোমল হয়ে আসে—কেবলমাত্র নিজস্ব এই একটা অদ্ভুত সুখানুভূতির রোমাঞ্চে, যেন নিষিদ্ধ ভালবাসার স্বাদ পায়, তবু অতসীর পূর্বজীবনের একটা টুকরো যে বারবার এসে মৃগাঙ্কর চোখকে আর মনকে ধাক্কা মেরে যাবে, এটাতেও স্বস্তি পায় না।

কিন্তু এই অবুঝ ভালবাসাকে ঠেকাবেই বা সে কি করে? কি করে বলবে "তুই আর আসিস না শ্যামলী!"

তার উপর আর এক ঝামেলা।

শ্যামলী তার ছেলেকে দেখাতে চায় মৃগাঙ্ক ডাক্তারকে। শুনে মনটা বোদা বিস্বাদ হয়ে

গিয়েছিল অতসীর। বেশ একটা বিরক্তি এসে গিয়েছিল তার উপর। এ তো বড় ঝঞ্ঝাট! এ আবার কী উপদ্রব! মনে হয়েছিল, নাঃ এ সবে দরকার নেই, স্পষ্টাস্পষ্টিই বলে দেবে শ্যামলীকে, এতে অতসী অস্বস্তি বোধ করে।

কিন্তু বলতে গিয়েও বলা যায় না। তাই ছেলের কী এমন হয়েছে সেটাই জিজ্ঞেস করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কী হয়েছে!

সেইটাই তো রহস্য!

কী যে হয়েছে বুঝতে পারছে না কোনও ডাক্তার বদ্যি। লক্ষণের মধ্যে, শুধু পায়ের হাড়ে ব্যথা, শুধু দুর্বলতা। অথচ বারবার 'এক্সরে' করেও ব্যথার কোনও উৎস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যথেষ্ট পরিমাণে যথোপযুক্ত খাইয়েও দুর্বলতা ঘোচানো যাচ্ছে না।

মৃগাঙ্ক যে 'বোন্' স্পেশালিষ্ট এটা যেন শ্যামলীরই গ্রহমুক্তির একটা নিদর্শন!

"মনে আশা হচ্ছে কাকীমা, এতদিনে হয়তো ফাঁড়া কাটল। নইলে খোকার যা অসুখ করেছে, ডাক্তার কাকাবাবু ঠিক তারই স্পেশালিষ্ট হলেন কেন!" বলেছিল শ্যামলী।

অতসী অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছিল ওর মুখের দিকে। কী সুখী এই নির্বোধ মানুষগুলো! এরা কত সহজেই সহজ হতে পারে!

রোখা গেল না শ্যামলীকে।

কি করে যাবে? কোন অমানবিকতায়? একটা শিশুর দুরারোগ্য ব্যাধির কাছে কি অতসীর তুচ্ছ মানসিক বাধার প্রশ্ন?

বিবেককে কী জবাব দেবে, যদি শ্যামলীকে ফিরিয়ে দেয়?

বলতে হ'ল মৃগাঙ্ককে।

মৃগাঙ্ক রাগ করল না, বিদ্রূপ করল না, আপত্তিও করল না, শুধু অতসীর মুখের দিকে একবার স্পষ্ট পরিষ্কার চোখে চেয়ে বললো, "নিয়ে এস।"

তা নিজে নিয়ে আসেনি অতসী। শ্যামলীকেই পাঠিয়ে দিয়েছিল ছেলে সঙ্গে দিয়ে, এবং গম্ভীরমূর্তি মৃগাঙ্কমোহন গভীর যত্নের সঙ্গেই দেখেছিলেন রোগীকে। আর জানিয়েছিলেন, হাড়ে কিছুই হয়নি, ব্যথার উৎস পেশীতে।

দুর্বলতা?

সেটা ভুল চিকিৎসার প্রতিক্রিয়া।

বার দুই দেখা আর ওষুধ দেওয়াতেই অদ্ভুতভাবে কাজ হ'ল। অতসী এতটা আশা করেনি।

ওদিকে শ্যামলী আর তার স্বামী বিগলিত।

তারপর থেকে দ্রুত উন্নতি হয়েছে। বেড়েছে ওজন। সেই ওজন বাড়ার সূত্র ধরেই আজ শ্যামলীর এত দুঃসাহস।

হ্যাঁ, সেই কথাটাই মনে হল অতসীর। মৃগাঙ্ককে সন্দেশ খাওয়াতে চায়! কী দুঃসাহস, কী ধৃষ্টতা!

অথচ শ্যামলীকে বলা চলে না সে কথা। তাই হাত পেতে নিতে হয় সেই সন্দেশ সম্ভার। যেটা বিপদের ডালির মত!

"ছেলেকে এবার আনিস একদিন।" বললো অতসী, "এখন তো হাঁটতে পারবে।"

"ও বাবা নিশ্চয়!"

শ্যামলী কেন সাধারণ ভদ্রতা বা সাধারণ সৌজন্যটুকুর মানে বোঝে না? কেন সেই মুখের কথাটাই বড় করে ধরে?

আজ যেন ফেরার তাড়া মাত্রও নেই শ্যামলীর, জাঁকিয়ে বসে কথা কইছে তো কইছেই।

"বুঝলেন কাকীমা, আপনার জামাই বলেন, 'ডাক্তার কাকাবাবু শুধু ডাক্তারই নয়, যাদুকরও। নইলে দেখালামও তো এ পর্যন্ত কমজনকে নয়, কেউ বুঝতে পারল না, আর উনি দেখলেন আর—"

"মোটেই ভাল ডাক্তার নয়!"

হঠাৎ একটা তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় মন্তব্যে শিউরে চমকে উঠল ঘরের আর দুজন।

বিছানার কোণ থেকে চেঁচিয়ে উঠেছে সীতু।

"ওমা, ও কিরে সীতু, ও কথা বলতে আছে?" শ্যামলী অবাক হয়ে বলে, 'খুব ভাল ডাক্তার তো!"

"ছাই ভাল।" বিদ্বেষে তিক্ত শিশুর কণ্ঠ কি কুৎসিত! ভাবল অতসী।

আর শ্যামলী ভাবল ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী। নিশ্চয় কোন কারণে বাপের ওপর রাগ হয়েছে ছেলের। পরক্ষণেই ভাবল—তা' বাপ ছাড়া আর কি? উপকারী আর স্নেহশীল মানুষকে পিতৃতুল্যই বলা হয় বৈ কি। ইনি যদি এমন উদারচিত্ত না হতেন, কোথায় আজ দাঁড়াত অতসী? কে জানে কোথায় ভেসে যেত সীতু!

ওবাড়ীর ছোটকাকার কী না কী অবস্থা ছিল, শ্যামলী তো আর ভুলে যায়নি? কী হালে কাটিয়েছে অতসী আর সীতু, তাও দেখেছে সে।

আর এখন?

এই রাজপুরীর কুমার হয়ে সুখের সাগরে গা ভাসিয়ে থাকা! কম ভাগ্য! এ বাড়ীর সাজসজ্জা আরাম আয়োজন ঔজ্জ্বল্য চাকচিক্য শ্যামলীকে মুগ্ধ করে।

বাড়ীতে বরের সঙ্গে আলোচনাও করে খুব।

মৃগাঙ্ক যদি এমন মহৎ না হতেন, মৃগাঙ্ক যদি এমন ধর্ম্মনিষ্ঠ না হতেন, কী হতো অতসীর দশা?

সুরেশের মৃত্যুর পর অতসীর প্রতি মৃগাঙ্কর যে ভাব জেগেছিল, সে শুধু নারীরূপের মোহ? শুধুই বেওয়ারিশ একটা মানুষের প্রতি উচ্ছৃঙ্খল লুব্ধতা?

তা যদি হত, বিবাহের সম্মান দিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে আসতেন? কী দরকার ছিল? তা না দিয়েও, ঘরে ঢোকবার অধিকার না দিয়েও, সেই মালিকহীন রূপবতীকে উপভোগ করবার বাধাটা কোথায় ছিল, যদি অভাবগ্রস্ত এবং মোহগ্রস্ত অতসী আত্মসমর্পণ করে বসতো?

বাধা সমাজও দিত না, আইনও দিত না। পুরুষের এ দুর্বলতা গ্রাহ্যের চক্ষেই আনত না কেউ।

অতসীকে? তা হয়তো সবাই ছিছিক্কার করতো, কিন্তু তাছাড়া আর তো কিছু করতো না!

মৃগাঙ্ক না দেখলে সুরেশ রায়ের আত্মীয় সমাজ ডেকে শুধোতো কি তাকে, "হ্যাঁ গো এখন তোমার কি ভাবে চলবে?" বলতো কি, "সীতুকে মানুষ করে তুলবে কি করে?"

ভাড়া দিতে না পারলে বাড়ীওলা যদি তাড়িয়ে দিত? সীতুর হাত ধরে অতসী কারও বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে সে কি দরজা খুলে ধরতো?

না, মানবিকতার প্রশ্ন নিয়ে কেউ এগিয়ে আসতো না। নেহাৎ যদি অতসী মান অপমানের মাথা খেয়ে কারুর পায়ে গিয়ে কেঁদে পড়তো, চক্ষুলজ্জার দায়ে সে হয়তো দিত এতটুকু ঠাঁই, একমুঠো ভাত, কিন্তু প্রতিদিন দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে সে অন্নের ঋণ শোধ করতে হতো।

নিস্পরের বাড়ীর দাসত্বে মাইনে আছে, মর্যাদা আছে। আত্মীয়জনের বাড়ীর দাসত্বে দুটোর একটাও নেই। উল্টে আছে গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, অবমাননা।

দুঃখে পড়ে আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় নেওয়ার চাইতে বড় দুঃখ বোধকরি জগতে দ্বিতীয় নেই।

বেশ করেছে অতসী, ঠিক করেছে।

দুজনেই বলেছিল ওরা—শ্যামলী আর শ্যামলীর বর, "ঠিক করেছেন কাকীমা।"

বলেছিল, "ছেলেটাকে পথের ভিখিরি হবার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন উনি।"

"তাছাড়া ভালবাসারও একটা মর্যাদা দিতে হয় বৈ কি", বলেছিল শ্যামলী। "ইনি, মানে ডাক্তারবাবু, কাকীমাকে সত্যিকার স্নেহের চক্ষে, ভালবাসার চক্ষে দেখেছিলেন।"

"তাতো সত্যি", বলেছিল তার বর, "নইলে আর বিবাহের মর্যাদা দেন?" আরও বলেছিল সে সীতুকে লক্ষ্য করে "লাকী বয়! ধর, তোমার কাকীমার যদি শুধু ওই মেয়েই থাকে, আর ছেলে না হয়, ওই অত সম্পত্তি, সব কিছুর মালিক তোমাদের সীতু। আর হয়ও যদি, বেশ কিছু তো পাবেই।"

কাজেই লাকী বয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত-চিত্ত শ্যামলী সীতুর এই সহসা উগ্র হয়ে ওঠা রূঢ়তায় বিস্মিত না হয়ে, হেসে উঠে বলে, "কি হল? হঠাৎ এত রাগ কিসের সীতুবাবুর?"

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে সীতু, অতসীর অবিচলিত ভ্রূম্লান মুখ থেকে সহসা উত্তর উচ্চারিত হচ্ছে, "আরে দেখনা, ওর পেটব্যথা করছে, ওষুধ খেয়ে কমেনি, তাই অত মেজাজ! সেই থেকে পড়ে পড়ে ছটফট করছিল—"

"ওমা তাই বুঝি!" হি হি করে হেসে ওঠে শ্যামলা, "সত্যিই তো বাপু, মেজাজ তো হতেই পারে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!"

মায়ের ওই অবিচলিত মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় বলেই কি সীতু আর কথা বলতে পারে না?

"মেয়েটি কে গো বৌদিদি?"

বামুন-মেয়ের উগ্র কৌতূহল আর বাঁধ মানে না, মনিবানীর ভ্রূভঙ্গীর ভয়েও না। সে কৌতূহল উক্ত প্রশ্নের আকারে এসে আছড়ে পড়ে অতসীর কাছে।

অতসী ভ্রূভঙ্গী করে।

বলে, "কোন মেয়েটি?"

"ওই যে কেবলই আসে যায়, দাদাবাবুকে অসুখ ছেলে এনে দেখায়, এইতো আজও এসেছিল—"

"আমার ভাইঝি।"

গম্ভীর কণ্ঠে বলে অতসী।

"ভাইঝি!" বামুন-মেয়ের বিস্ময় যেন আকাশে ওঠে। "ভাইঝি যদি তো, তোমায় কাকীমা বলে কেন গো?"

"বলে, ওর বলতে ভাল লাগে।" অতসী কঠিন মুখে বলে, "কে কাকে কি বলে ডাকে, তা নিয়ে তোমার এত মাথা ঘামানোর কি আছে?"

"ওমা শোন কথা! মাথা ঘামানো আবার কি? ডাকটা কানে বাজলো তাই বলেছি। দেখিনি তো ওকে কখনো এর আগে। আমি তো আজকের নই, কত কালের। তোমার শাশুড়ীর আমল থেকে আছি। এদের যে যেখানে আছে সবাইকে জানি চিনি।" সগর্বে ঘোষণা করে বামুন-মেয়ে।

"ভালই তো!" বলে চলে যায় অতসী, আর মনে ভাবে ঠিক এই কারণেই তোমাকে আগে বিদায় করা দরকার। আমার সমস্ত নিশ্চিন্ততার ওপর কাঁটার প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমায় দেব না আমি।

"এত কথা তুমি জানলে কি করে ?"

"বাঃ পাড়ায় পড়ে থাকি, আর এটুকু তথ্য রাখব না ? ডাক্তার খুবই ভাল।"

"খোকনের ব্যাপারে দেখলামও তো। কিন্তু কাকীমার সঙ্গে রিলেশান খুব ভাল বলে মনে হয় না। অবশ্য এ ধরনের বিয়েয় হওয়া শক্ত।"

'তা কেন ? এতেই তো হবে। ইচ্ছে করে ভালবেসে যখন বিধবা জেনেও বিয়ে করেছেন'--

'তা' করেছেন সত্যি। তবু যে মেয়ের একটা অতীত ইতিহাস রয়েছে, নিজে সে সম্পূর্ণ সুখী হবে কি করে ? এ জীবনের মাঝখানে সেই অতীত ছায়া ফেলবেই।'

'আহা গোপন কিছু তো নয় ?'

'নাই বা হল। তবু উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা পুরানো দিনের গল্প করতে বাধবে, সে জীবনের সুখ দুঃখ আশা হতাশার কাহিনী বলতে বাধবে, হঠাৎ কোন ছলে প্রথম প্রেমের অনুভূতির কথা উঠে পড়লে, সুর যাবে কেটে, অতএব জীবনের সেই কয়েকটা বছরকে একেবারে 'সীল' করে সিন্দুকে তুলে রাখতে হবে। স্বচ্ছন্দতাই যদি না থাকল, সুখটা অব্যাহত রইল কোথায় ?'

'হুঁ। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই তো চলেও আসছে এ প্রথা।'

শ্যামলী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'প্রথা জিনিসটা হচ্ছে প্রয়োজনের বাহন, ওর সঙ্গে প্রকৃত সুখের সম্পর্ক কি ? নিঃসন্তান লোকদের তো দত্তক নেওয়ার প্রথা আছে। তাই বলে কি নিজের সন্তানের মত হয় সে ?'

'এ তুলনাটা কি রকম হ'ল ?'

'যে রকমই হোক, আমি বলতে চাইছি প্রয়োজনের খাতিরে অনেক প্রথাই চলে আসছে সমাজে, তার মধ্যে প্রাণের স্পর্শ থাকে না।'

'তা পুরুষেরা তো দিব্যি দ্বিতীয়পক্ষ, তৃতীয়পক্ষ নিয়ে আনন্দের সাগরে ভাসে।'

শ্যামলী মুখ টিপে হেসে বলে, 'হবে হয় তো। সে সাগরের খবর তো আমি রাখি না। তুমি ভাল করে জানতে পারবে আমার জীবনান্তের পর যখন নতুন পক্ষ মেলে উড়বে।'

হেসে ওঠে দু'জনে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ খুনসুড়িতে। অকারণ হাসি অকারণ কথায়।

এক সময় আবার বলে, "আচ্ছা তোমার কাকার সঙ্গে ওঁর রিলেশানটা কি রকম ছিল ?"

'আমার কাকার কথা আর তুলো না।' শ্যামলী বলে, 'গুরুজন মরেছেন স্বর্গে গেছেন, তবে না বলে পারছি না, তিনি মানুষ নামের অযোগ্য ছিলেন। নেহাৎ তো ছোটই ছিলাম, তবু কি বলবো কেবলই ইচ্ছে হতো ওঁর কাছ থেকে কাকীমাকে চুরি করে নিয়ে পালাই।'

'সাধু ইচ্ছে! যাক, ভদ্রলোক আর যাই হোন একটা বিষয়ে অন্ততঃ বুদ্ধির কাজ করেছিলেন, সময় থাকতে মারা গিয়েছিলেন।'

শ্যামলী হেসে ফেলে বলে, "মারা যাবার পর এমন একটা ব্যাপার ঘটবে জানলে, খুব সম্ভব মারা যেতেন না।"

"আচ্ছা ধর, তোমার কাকা যদি ওরকম হৃদয়হীন প্যাটার্ণের না হতেন, ধর খুব প্রেমিক মহৎ স্নেহশীল স্বামীই হতেন, মারা গেলে তোমার কাকীমার প্রয়োজনের সমস্যাটা তো সমানই থাকতো সে ক্ষেত্রে? মানে কেবলমাত্র এঁদের সম্বন্ধে বলছি না, জেনারেল ভাবেই বলছি, তেমন হলে কিংকর্ত্তব্য?"

"কর্তব্য নির্দ্ধারণ করা অপরের কর্ম নয়" বলে শ্যামলী, "এই হচ্ছে সাদা কথা। কে যে কোন অবস্থায় কি করতে বাধ্য হয় বলা শক্ত। কারণ হৃদয়ের চাইতে পেটের দাবী বেশী প্রত্যক্ষ। তাছাড়া প্রশ্ন তো কেবল নিজেকে নিয়েই নয়, প্রধান প্রশ্ন আরও মেম্বারদের নিয়ে। নিজে 'না খেয়ে পড়ে থাকব' বলে জোর করা যায়, 'ওরা না খেয়ে পড়ে থাক' বলা যায় না। সে ক্ষেত্রে অপরের কর্তব্য হচ্ছে সমালোচনা না করা। আমি তো এই বুঝি।"

"হায় অবোধ বালিকা! জগতে যদি সমালোচনা বস্তুটাই না থাকল, তাহলে রইল কি?"

"রইল মানুষ।"

"সমালোচনা আছে তাই মানুষ মানুষ-পদবাচ্য। অন্যের সমালোচনার মুখে পড়বার ভয় না থাকলে, কি দায় থাকতো মানুষের শৃঙ্খলা মেনে চলবার, নিয়ম মেনে চলবার?"

"যাকগে বাবু এসব বাজে কথায়। তুমি একদিন চলনা ওখানে।"

"আমি? ক্ষেপেছ!"

"কেন, এতে ক্ষ্যাপার কি হ'ল?"

"বাবা, ডাক্তারকে দেখলে দূরে থেকেই আমার হৃৎকম্প হয়, যা গম্ভীর মুখ! কি করে যে তোমার কাকীমা—"

"ও একটা কথাই নয়। নারকেলের মধ্যে মজুত থাকে চিনির সরবৎ। কাকীমাও তো গম্ভীর।"

"তা যাই বল, এই গম্ভীর গম্ভীর মানুষগুলোর মধ্যে প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি বস্তুগুলো যে কোন কোটরে থাকে, তাই ভাবি।"

তা সে কথা কি শুধু অপরেই ভাবে?

অতসীও যে আজকাল ভাবতে সুরু করেছে সেই কথা। মৃগাঙ্কর হালকা হওয়ার ইচ্ছেটা টিঁকল আর কই? হ'ল না। হয় না। তাই অতসী ভাবে, কোথায় ছিল মৃগাঙ্কর মধ্যে অত স্নেহ, অত স্নিগ্ধতা? আজকের এই গম্ভীর রুক্ষ ক্লিষ্ট মৌন মূর্তি মানুষটাকে দেখে কি চেনবার উপায় আছে—মানুষটা একদিন গম্ভীরভাবে প্রেমে পড়েছিল?

কিন্তু এতবেশী মৌনতা সহ্য করা যায় কি করে ?

অতসীর যে কী হয়েছে আজকাল, যখন তখন ইচ্ছে করে মৃগাঙ্কর সঙ্গে ভয়ানক রকম একটা ঝগড়া বাধায়, রাগে ফেটে পড়ে চেঁচামেচি করে, অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটিয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করে।

কেন যে এমন ইচ্ছে হয় ?

সুরেশ রায়ের সংসারে, সুরেশ রায়ের নিষ্ঠুরতার মধ্যেও যে-মেয়ের কখনো মুখ ফোটেনি, তার এমন উগ্র উন্মাদ ইচ্ছা কেন ?

তা' সবের কারণই বুঝি সীতু।

সীতুকে বাদ দিয়ে দুজনের জীবন কল্পনা করলে বোঝা যায়—

কিন্তু তাও হয় না।

সীতুকে বাদ দেওয়ার মত ভয়ানক অলক্ষণে চিন্তা এক ধাপের বেশী এগোতে পারে না।

খুকু আছে সত্যি।

খুকু অতসীর চোখের আনন্দ, প্রাণের পুতুল, কিন্তু সীতু যেন বুকের ভিতরকার হাড়।

অথচ সীতুরও কী এক দুর্দান্ত নেশা, মাকেই যন্ত্রণা দেবে। নখে ছিঁড়ে ফেলবে মার সমস্ত সুখ, সমস্ত শান্তি।

তাই আবার একদিন তোলপাড় হয়ে ওঠে সংসার সীতুর হিংস্র দুর্বুদ্ধিতে।

খাওয়ার পর জল খাওয়া অভ্যাস মৃগাঙ্কর। বড় এক গ্লাস জল ঢাকা দেওয়া থাকে ঘরের টেবিলে। রূপোর গ্লাস, রূপোর রেকাবী চাপা। মৃগাঙ্কর মায়ের আমল থেকে এই ব্যবস্থা।

খাওয়ার পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামের শেষে বেরোবার আগে এক চুমুকে জলের গ্লাসটা খালি করে তবে পোষাক পরতে সুরু করেন মৃগাঙ্ক, আজও তাই করেছিলেন, কিন্তু না শেষ পর্যন্ত নয়।

নিয়ম পালন হয়েছিল জলটা চুমুক দেওয়া পর্যন্তই। পরক্ষণেই ভীষণ একটা আলোড়নের বেগে ছুটে যেতে হল মৃগাঙ্ককে বমি করতে।

খাবার জলটা লবণাক্ত !

সন্দেহ নেই যে খুব ধীর হাতে জলের গ্লাসের মধ্যে একটি নুনের ডেলা ছাড়া হয়েছিল, তাই প্রথমটা টের পাননি মৃগাঙ্ক। ঢকঢক করে খেয়ে নিয়েছেন। টের পেলেন গ্লাস খালি করার সময়, জলের তলাটা নুনে ভর্তি।

কোথা থেকে এল !

যেমন ঢাকা দেওয়া তেমনিই রয়েছে !

কোন ফাঁকে কে ওই সৈন্ধবের ডেলাটি দিয়ে রেখে ফের চাপা দিয়ে গেছে।

এ ঘটনা দৈবের হতে পারে না, কোন সূত্র ধরেই বলা চলে না অসাবধানে কিছু একটা হয়ে গেছে। অবশ্য ভৌতিকও নয়।

তবে?

'তবে'র আর আছে কি?

এহেন ঘটনা তো যখন তখনই ঘটেছে, কিছুদিন একটু থামা পড়েছিল।

হ্যাঁ, কিছুদিন একটু থামা পড়েছিল।

একটু নিশ্চেষ্ট ছিল সীতু। যবে থেকে সন্দেহ ঢুকেছিল।

হয়তো বা নিজের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের সাধনাই করছিল, কিন্তু কি থেকে যে কি হয়!

সকালে আজ বাগানে নেমে এসেছিল সীতু। অন্ততঃ সীতু যাকে 'বাগান' বলে। গেটের ভিতর কম্পাউণ্ডের মধ্যে কেয়ারী করা গাছের সারিতে ফুল ফোটে দৈবাৎ, পাতারই বাহার।

আজ দু'একটা গাছ আলো হয়ে উঠেছিল সীজন ফ্লাওয়ারে।

জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে নেমে এল সীতু। একগোছা ফুল নিয়ে খুকুটার ওই থোকা থোকা চুলের খাঁজে গুঁজে দেবে। গতকাল পার্কে দেখেছে একটা কোঁকড়া-চুল মেয়ের চুলে ফুলসজ্জা।

অবশ্য যা কিছু করবে সবই অপরের চোখ থেকে লুকিয়ে। কারুর সামনে কোন কিছু করতে চায় না সে।

কেন?

সেই এক রহস্য।

খুকুর জন্যে প্রাণ ফেটে যায়, কিন্তু কারও সামনে তাকিয়ে দেখে না পর্যন্ত।

আজ দেখল মৃগাঙ্ক তখনও নিদ্রিত, চাকররা এদিক ওদিকে। নেমে এল চুপিচুপি, চারিদিক তাকিয়ে পটপট করে ছিঁড়ে নিল কয়েক গোছা ফুল, আর আশ্চর্য, এই মাত্র যাকে ঘুমন্ত দেখে এসেছে, সেই মানুষ দোতলার বারান্দা থেকে দিব্যি খোলা গলায় বলে উঠল, "বাঃ চমৎকার!"

চমকে চোখ তুলেই চোখটা নামিয়ে নিয়ে হাতের ফুলগুলো তক্ষুনি ফেলে দিয়েছিল সীতু, কিন্তু সেই "বাঃ চমৎকার" শব্দটিকে কোথাও ফেলে দিতে পারল না সে। সে শব্দ অনবরত কানের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা ফেলতে লাগল, "বাঃ চমৎকার!"

তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, কিন্তু ওই ব্যঙ্গোক্তিটা তুচ্ছ করবার নয়।

দাহে ছটফট করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে উপরে আসতে গিয়ে ধাক্কা। মৃগাঙ্ক নামছেন। তাঁরও যে বরাবরের অভ্যাস সকালে ওই বাগান তদারক।

যদি মৃগাঙ্ক ধমকে উঠতেন, তাহলে এতটা দাহ হ'তনা, কিন্তু জ্বলিয়ে দিয়েছিল ক্ষুদ্র ওই ব্যঙ্গটুকু।

"বাঃ চমৎকার"—শুধু এই কথাটুকুর মধ্যেই ছিল অনেক কথা!

পরক্ষণেই আবার সিঁড়িতে দেখা।

কিন্তু সেখানে তো ব্যঙ্গের ভাষা ব্যবহার করেন নি মৃগাঙ্ক। শুধু মৃদুগম্ভীর একটি প্রশ্ন করেছিলেন, "ফুল চাইলে কি পাওনা? অমন চোরের মত চুপিচুপি নেবার দরকার কি?"

আর কিছু নয়।

নেমে গিয়েছিলেন মৃগাঙ্ক, সীতুও উঠে এসেছিল। কিন্তু সেই থেকে আবার সীতুর 'কাঠত্ব' প্রাপ্তি।

সীতু আর সীতুর পরম শত্রুটাকে থাকতেই হবে এক বাড়ীতে? আর কোন উপায় নেই? মা যে বলেছিল অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে—দেখা যাচ্ছে সেটা নেহাতই স্তোক-বাক্য। সেই আশায় কত ভাল হবার চেষ্টা করেছিল সীতু, কিন্তু মা'টা মিথ্যাবাদী।

মা'র বিশ্বাসঘাতকতায় সেদিন তো সীতু নিরুদ্দেশ হয়েই যাচ্ছিল, পার্কে বেড়াতে গিয়ে আর আসবে না বলে চলেও গিয়েছিল অনেক দূর। কিন্তু একটু রাত্তির হয়ে যেতেই কি রকম ভয় ভয় করল। ফিরে এসে আবার বসে রইল পার্কের বেঞ্চে। অনেক রাতে বীর বাহাদুর এসে ধরে নিয়ে গেল।

তা' সেদিন কেউ কিছু বলেনি সীতুকে।

অতসীও না।

শুধু কেমন এক রকম করে যেন তাকিয়ে খুব বড় করে নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

মায়ের ওই নিঃশ্বাসফিশ্বাসগুলো তেমন ভাল লাগে না। তাই না সীতু ক'দিন ধরে চেষ্টা করছিল ভাল হবার!

কিন্তু ওই, কি থেকে যে কি হয়!

এক বাড়ীতে দু'জনের থাকা চলবে না।

দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছিল সীতু। সীতুর মরে গেলেই হয়। মরার অনেক উপায় ঠাওরাল সীতু। কিন্তু কোনটাই তার ক্ষমতার মধ্যে নয়।

তাছাড়া—

সেই কথাটা না ভেবে পারল না সীতু—মা? মার সেই কেমন এক রকম করে চাওয়া আর নিঃশ্বাস ফেলা! সীতু মরে গেলে, মার প্রাণে লাগবে।

তার থেকে ওই লোকটাকে সরিয়ে দিলেই সব শান্তি।

কিন্তু মরে কই?

লোকটা যেন 'প্রহ্লাদের' মতন।

কতবার কত চেষ্টা করল সীতু, কিছুই হ'ল না।

বামুনমেয়েরা সেদিন বলাবলি করছিল ওদের পাড়ায় কে যেন ভেদবমি হয়ে মারা গেছে। বলছিল "কী দিনকাল পড়েছে! দু'বার ভেদ দু'বার বমি, ব্যস! জলজ্যান্ত মানুষটা মরে গেল।"

'ভেদ' কথাটার মানে ঠিক জানে না সীতু। কিন্তু পরবর্তী কথাটার মানে জানে।

অতএব 'দিনকালে'র প্রতি পরম আস্থা নিয়ে চুপি চুপি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা। বেগ পেতে হ'ল না, সহজেই হল। কাঠের একটা বড় গামলায় উঁচু করে ঢালা ছিল সৈন্ধবের টুকরো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল?

শুধু খুব খানিকটা হৈ চৈ চেঁচামেচি, কে করেছে, কি করে হল বলে বিস্ময় প্রকাশ, তারপর প্রত্যেকবার যা হয় তাই। মস মস করে জুতোর শব্দ তুলে চলে গেল শত্রুপক্ষ। সীতু দাঁড়িয়ে রইল অনেকগুলো জলন্ত দৃষ্টির সামনে।

সাধে কি আর প্রহ্লাদের সঙ্গে ওকে তুলনা করে সীতু?

মারলে মরে না, কাটলে কাটা পড়ে না, বমি করেও মরে না।

শুধু সীতুকে অপদস্থ করতে, তাকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে চলে যায়।

কেন, ও পারে না সীতুকে খুব ভয়ঙ্কর শাস্তি দিতে?

তাতেও বুঝি সীতুর দাহ কিছু কমতো!

কিন্তু সীতু হাল ছাড়বে না, ঠিক একদিন মেরে ফেলবে ওকে।

আচ্ছা, মটর গাড়ীর পেট্রল অনেকখানিটা নিয়ে আসা যায় না লুকিয়ে?

সেদিন বীরবাহাদুর কোথা থেকে যেন এনেছিল। প্রকাণ্ড একটা কাঁকড়াবিছে বেরিয়েছিল রান্নাঘরের পিছনে, বীরবাহাদুর ঝপ্ করে তার গায়ে পেট্রল ঢেলে দিয়ে দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

কেউ যখন ঘুমোয়, তখন—

পেট্রল কোথায় থাকে, আদৌ বাড়ীতে থাকে কি না এ সব তথ্য জেনে নিতে হবে।

দেশলাই?

দেশলাই একটা জোগাড় করা কিছু এমন শক্ত নয়।

'আমি বলি কি, ওকে কোন একটা বোর্ডিঙে ভর্তি করে দেওয়া হোক।'

অতসী এসে প্রস্তাব করে।

মৃগাঙ্ক অতসীর জলভারাক্রান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু গম্ভীর স্বরে বলেন, 'মিথ্যে অভিমান করছ কেন অতসী? আমি কি ওর প্রতি ভয়ানক একটা কিছু দুর্ব্যবহার করছি? কেউ কি ছেলে শাসন করতে এটুকু কঠোরতা করে না?'

অতসী বিষণ্ণ দৃঢ়স্বরে বলে, 'না, এ আমার মান অভিমানের কথা নয়। ভেবে চিন্তেই বলছি। এতদিন নেহাৎ শিশু ছিল, কিছু উপায় ছিল না। এখন বড় হয়েছে, বোর্ডিঙে রাখা শক্ত নয়। ছেলের শিক্ষার জন্যে অনেকেই তো রাখে এমন। খরচ হয়তো অনেক হবে, কিন্তু তোমার তো টাকার অভাব নেই?'

টাকা!

'টাকা! তা' বটে!' মৃগাঙ্ক ডাক্তার হাসেন, 'মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় অতসী, ওটাই আমার একমাত্র কোয়ালিফিকেশন ছিল কি না।'

'কী বললে?'

চেঁচিয়ে উঠল অতসী। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

'সত্যি করে কিছু বলিনি অতসী, শুধু মাঝে মাঝে সন্দেহ হওয়ার কথাটা বলছি। জগতে এ রকম তো কতই হয়।'

'জগতে কত রকম হয়, তার একটা দৃষ্টান্ত যে আমি, এটা স্বীকার করছি। সন্দেহ করবে, এর আর আশ্চর্য কি?' অতসী ম্লান হেসে বলে, 'ও তর্ক করে কোন লাভ নেই, আমি যা বলতে এসেছি সেই কথাটাই শেষ হোক। ওকে বোর্ডিঙে ভর্তি করে দিলে ওরও লাভ, আমারও লাভ।'

'তোমার কি ধরনের লাভ সেটা তুমিই বোঝ, তবে তাতে আমার একটা মস্ত লোকসান ঘটবে সন্দেহ নেই। ওকে বাড়ি ছাড়া করলে তোমার মনটাই কি বাড়িতে থাকবে?'

অতসী এবার জোর করে হাসবার চেষ্টা করে। আদুরে আদুরে মিষ্টি হাসি। 'আহা, আমি যেন তেমনি অবুঝ? ছেলেমেয়ের শিক্ষাদীক্ষার জন্যে কত বাচ্চা বাচ্চা বয়সে কত দূর দূর বিদেশের বোর্ডিঙে পাঠিয়ে দিচ্ছে লোকে, দেখিনি বুঝি আমি?'

মৃগাঙ্ক ডাক্তারও হাসেন। মিষ্টি হাসি নয়, ক্ষুব্ধ হাসি।

'সকলের মতো তো নই আমরা অতসী!'

'হতেই তো চাই আমি।'

'চাইলেই হয় না। আমিই কি চাইনি? বল অতসী,' মৃগাঙ্কর গলার স্বরটা ভরাট ভারি ভারি হয়ে ওঠে, 'আমি কি সাধ্যমত ওকে আপনার করবার চেষ্টা করি নি? আমি ওর প্রতি পিতৃকর্তব্যের কোন ত্রুটি করেছি? ওকে নিয়ে তোমার খুব বেশী ক্ষুব্ধ হবার কোন কারণ ঘটেছে? কিন্তু সেই এতটুকু শিশু থেকে ও আমাকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে, আমাকে এড়িয়ে চলতে চাওয়া ভিন্ন কাছে আসতে চায়নি কখনো।'

মাথা হেঁট হয়ে যায় অতসীর।

না গিয়ে উপায় নেই বলে। মৃগাঙ্কর কথা তো মিথ্যা নয়। প্রথম প্রথম সীতুর মনোরঞ্জনের জন্যে বহু চেষ্টা করেছে মৃগাঙ্ক। হয়তো সে চেষ্টা অতসীরই মনোরঞ্জনের চেষ্টা। হয়তো মনের বিরক্তি, চোখের রুক্ষতা চাপা দিয়ে স্নেহের অভিনয় করেছে। হয় তো অনেক সাধনালব্ধ প্রেয়সীর মনে শুধু প্রেমিকেরই নয়, শুধু স্বামীরই নয়, দেবতার আসনের জন্যও একটু লোভ ছিল মৃগাঙ্কর। যে কারণেই হোক, চূড়ান্ত উদারতা দেখিয়েছিল মৃগাঙ্ক, সীতুকে চূড়ান্ত আদর করেছিল। কিন্তু সীতুর দোষেই সব গেল।

সীতুই অতসীর মাথা হেঁট করেছে।

সেই একটুখানি শিশু অত যত্ন সমাদরের কোন মূল্য দেয় নি। মৃগাঙ্ক আহত হয়েছে, ক্ষুব্ধ হয়েছে, হয়তো বা অপমান বোধ করেছে। অতসী পারে নি তার প্রতিকার করতে, পারে নি সেই একফোঁটা ছেলেকে বাগে আনতে।

কিন্তু কেন?

ভেবে ভেবে কোনদিন কূল কিনারা পায় নি অতসী, কেন এমন? ছোট বাচ্চারা সর্বদা কাছাকাছি থাকতে থাকতে তুচ্ছ একটা ঝি চাকরেরও কত অনুরক্ত হয়, অনুগত হয় পাড়াপড়শী মামা কাকার, অথচ যে মৃগাঙ্ক সীতুকে দু'হাত ভরে দিয়েছে, দিয়েই চলেছে, রাজপুত্তুরের যত্নে রেখেছে, তাকেই সীতু দু'চক্ষের বিষ দেখে আসছে বরাবর। তাও বা ছোটতে যাহোক মানিয়ে নেওয়া যেত অবোধ বলে, শিশুর খেয়াল বলে। এত মাথা কাটা যেত না তখন। কিন্তু সীতু বড় হয়ে পর্যন্ত প্রতিনিয়ত একী লজ্জা, একী অশান্তি অতসীর!

কোন দৈত্যের ঘর থেকে মৃগাঙ্ক অতসীকে তুলে এনেছে এই রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে, প্রেমের সিংহাসন আর সোনার সিংহাসন দুই দিয়েছে পেতে! অতসীর সুখের জন্যে কত করেছে, কত ছেড়েছে, অথচ অতসী কিছুই পারল না। সামান্য একটা ক্ষুদে ছেলের মন ঘোরাতে পারল না মৃগাঙ্কর দিকে।

হয়তো মৃগাঙ্ক ভাবে অতসীর চেষ্টা নেই, চেষ্টা থাকলে কি আর মায়ে পারে না ছেলের মন বদলাতে? কোলের ছেলের? শিশু ছেলের?

কতদিন ভেবেছে অতসী, মৃগাঙ্ক তো এমন সন্দেহও করতে পারে, অতসী ইচ্ছে করেই ছেলের মন ধরে রাখতে চায়, একেবারে সংরক্ষিত রাখতে চায় নিজের জন্যে। যে ছেলে অতসীর একার। সম্পূর্ণ একার!

মৃগাঙ্ক নতনয়না অতসীর দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে বলে, চাইলেই সব হয় না অতসী! যা হবার নয় তা হয় না! তুমি আর মন খারাপ করে কি করবে?'

অতসী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তা যদি না হবার হয় তো হওয়ানোর চেষ্টা করেই বা লাভ কি? যত বড় হচ্ছে ততই তো আরও একগুঁয়ে আরও অবাধ্য হচ্ছে।

বোর্ডিঙে পাঁচটা ছেলের সঙ্গে থাকলে হয়তো একটু সভ্য হবে, বাধ্য হবে,—ভালই হবে ওর।'

'তুমি থাকতে পারবে না অতসী!'

'কে বললে পারবো না?' অতসী জোর দিয়ে বলে, 'ঠিক পারবো। এইতো খুকুর হৈ চৈতে কোথা দিয়ে দিন কেটে যায়। মন কেমনের সময়ই থাকবে না।'

'অত চট করে সর্বস্ব দানের দানপত্রে সই করে বোস না অতসী!'

অতসীর চোখে সহসা জল এসে পড়ে। উত্তর দিতে দেরি হয়, তবু সামলে নিয়ে বলে, 'কিন্তু এভাবে কি করে চলবে? তুমিও তো আর ওর ওপর স্নেহ রাখতে পারছ না? তুমিও তো খুকু হয়ে পর্যন্ত—'

এবার আর সামলাতে পারে না অতসী। সব বাঁধ ভেঙে নামে বন্যা।

কথাটা মিথ্যা নয়।

খুকু জন্মে পর্যন্তই মেজাজটা বড্ড যেন বদলে গেছে মৃগাঙ্কর। আগে বিরূপতা করতো সীতুই, মৃগাঙ্ক চেষ্টা করতো সহজ হতে। এখন যেন দু'জনের হাতেই ধারালো অস্ত্র!

কিন্তু মৃগাঙ্করই বা দোষ কি?

কি করে সে নিজের ওই ফুলের মত মেয়েটিকে নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দেবে তার সংস্পর্শে, যার রক্তে রয়েছে সংক্রামক রোগের সন্দেহ!

প্রথম প্রথম যখন মৃগাঙ্ক খুকু সম্পর্কে অস্বস্তি করেছে, খুকুকে কেড়ে নিয়েছে সীতুর কাছ থেকে, তখন হঠাৎ একদিন ফেটে পড়েছিল অতসী, স্বভাব ছাড়া তীব্রতায় বলেছিল, 'অত অমন কর কেন? ও কি তোমার মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে? দেখতে পাও না কত ভালবাসে ওকে?'

সেদিন প্রকাশ করেছিল মৃগাঙ্ক নিজের অসহিষ্ণুতার কারণ। বলেছিল, 'হাতে করে বিষ খাইয়ে মারবে, এমন কথা কেউ বলেনি অতসী, কিন্তু পরোক্ষ বলেও তো একটা কথা আছে? এমনও তো হ'তে পারে ওর রক্তের মধ্যে বিষ লুকিয়ে আছে। যদি থাকে, সুযোগ পেলে বিষ নিজের ডিউটি পালন করবেই। আর কুষ্ঠর বিষ—'

শুনে চুপ করে গিয়েছিল অতসী।

বুঝতে পেরেছিল কোথায় মৃগাঙ্কর বাধা। তারপর একটু থেমে ম্লানস্বরে বলেছিল, 'ওর জন্মাবার পরে তো—'

'প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে হয়তো পরে, কিন্তু ওর জন্মের আগেই যে রোগটা জন্মায়নি, তা'ও জোর করে বলা যায় না অতসী! রোগ প্রকাশ হবার আগে অনেক দিন ধরে নিঃশব্দে লুকিয়ে থাকে রোগের বীজ, এ শুধু আমি ডাক্তার বলেই জানি তা' নয়, সবাই জানে।'

'তাহলে'—বলতে গলা কেঁপে গিয়েছিল অতসীর, 'তাহলে সীতুকে ভাল করে পরীক্ষা করছ না কেন একবার?'

'করেছি অতসী! তোমার মিথ্যা উৎকণ্ঠা বাড়ানোয় লাভ নেই বলে তোমাকে না জানিয়ে করেছি পরীক্ষা—'

'পরীক্ষার ফল?'

আরও কেঁপে গিয়েছিল অতসীর গলা।

'ফল এমন কিছু ভয়ঙ্কর নয়, কিন্তু তবুও সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ছোট্ট বাচ্চারা একেবারে ফুলের মত, এতটুকুতেই ক্ষতি হতে পারে ওদের।'

শুনে আর একবার বুকটা কেঁপে উঠেছিল অতসীর, আর এক আশঙ্কায়। ছোট্ট ফুলের মতটির অনিষ্টের আশঙ্কায়। সেখানেও যে মাতৃহৃদয়! মা হওয়ার কী জ্বালা!

অতসীর ক্ষেত্রে বুঝি সে জ্বালা সৃষ্টিছাড়া রকমের বেশী, এই জ্বালাতেই সমস্ত পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও কিছুই পেল না অতসী।

কিন্তু এমন দুঃসহ যন্ত্রণার কিছুই হ'ত না, যদি সীতুর স্মৃতিশক্তিটা অত প্রখর না হতো! যদি বা সীতু তখন আরও একটু ছোট থাকতো!

ঠিক অতসীর এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি করেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার, 'হয়তো আমরা সত্যিকার সুখী হ'তে পারতাম অতসী, যদি সীতু তখন আরও ছোট থাকতো। বলেছি তো একটা বাচ্চা ছেলের কাছে হেরে গেছি আমরা।'

অতসী দৃঢ়স্বরে বলে, 'আর হেরে থাকতে চাই না। সুখী হতেই হবে আমাদের। আমি যা বলছি সেই ব্যবস্থাই কর তুমি।'

'বললাম তো—' মৃগাঙ্ক হাসেন, 'এত চট করে দানপত্রে সই করে বসতে নেই। যাক আরও কিছুদিন। হয়তো আর একটু বড় হলে ওর এই দস্য স্বভাবটা শোধরাবে।'

হয়তো অতসী আরও কিছু বলতো। হয়তো বলতো, শোধরাবার ভরসাই বা কি? রক্তের মধ্যে যে উত্তরাধিকারসূত্রে শুধু রোগের বিষই প্রবাহিত হয় তা তো নয়? স্বভাবের বিষ? মেজাজের বিষ? সেগুলোও তো কাজ করে? বলতো, আর শোধরাবার উপায় নেই। সব জেনে ফেলেছে সীতু।'

কিন্তু বলা হয়নি, টেলিফোনটা বেজে উঠেছিল, মৃগাঙ্কর ডাক পড়েছিল।

থম থম করে কাটে কয়েকটা দিন।

বাড়িটাও স্তব্ধ।

মৃগাঙ্ক ডাক্তার যেন নিঃশব্দ হয়ে গেছেন।

অতসী জিদ ধরেছে সীতুকে বোর্ডিঙে ভর্তি করে না দিলে অতসীই বাড়ি ছাড়বে। মৃগাঙ্ক এর অন্য অর্থ করেছেন। ভেবেছেন অভিমান।

আশ্চর্য! পৃথিবীটা কী অকৃতজ্ঞ! যাক্ থাকুক বোর্ডিঙে, হয় তো সেই ভাল।

ভারি গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন মৃগাঙ্ক। সীতুর দিকে আর তাকিয়ে দেখেন না, এমন কি স্পষ্ট একদিন দেখলেন নিজের খাওয়া দুধ থেকে খুকুকে দুধ খাওয়াচ্ছে সীতু, বোধ করি ইচ্ছে করেই মৃগাঙ্ককে দেখিয়ে দেখিয়ে, তবু একটি কথা বললেন না। মিনিট খানেক তাকিয়ে দেখে সরে গেলেন। গেলেন সীতুরই জামাজুতো কিনতে। ছেলেকে অন্যত্র রাখবার প্রস্তুতি। বড়লোকের ছেলেদের জায়গায়, বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গেই তো থাকতে হবে মৃগাঙ্ক ডাক্তারের ছেলেকে?

কিন্তু সীতু?

সীতু ক্রমশঃই ক্ষেপে যাচ্ছে।

মাকে যেমন করে সেদিন মেরে ধরে আঁচড়ে কামড়ে যা খুসী বলেছে, তেমনি করে মেরে আঁচড়ে কামড়ে যা খুসী বলতে ইচ্ছে হয় তার মৃগাঙ্ককে।

তাই চেষ্টা করে বেড়ায় কিসে ক্ষেপে যাবেন মৃগাঙ্ক।

সেই ক্ষেপে যাবার মুহূর্তে যখন সেদিনের মত কান ঝাঁকুনি দিতে আসবেন, তখন আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে না সীতু, ঝাঁকিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে এলোপাথাড়ি ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বলবে, 'কেন কেন তুমি আমাকে মারতে এসেছ? কে তুমি আমার? তুমি কি আমার সত্যি বাবা? তুমি কেউ নও, একেবারে কেউ নও! তুমি মিথ্যুক! আমার বাবা মরে গেছে।'

কিন্তু সে সুযোগ আর আসে না।

খুকুকে এঁটো দুধ খাওয়ানোর মত ভয়ঙ্কর কারণ ঘটিয়েও না। মৃগাঙ্ক কেবল জিনিসের উপর জিনিস আনছেন।

অতসী হতাশ হয়ে বলে, 'কি করছো তুমি পাগলের মতন? কত এনে জড়ো করছো? আট বছরের একটা ছেলে আটটা সুটকেস নিয়ে বোর্ডিঙে যাবে, ক্লাস ফোরের পড়া পড়তে? এ কী অন্যায় টাকা নষ্ট!'

'নষ্ট করার মত অনেক টাকা যে আমার আছে অতসী!' মৃগাঙ্ক ম্লান হেসে বলেন, 'তাই করছি।'

'ওকে বাড়ি থেকে সরাতে আমার চাইতে তো দেখছি তোমার অনেক বেশী মন কেমন করছে।'

'কিছু না অতসী, কিছু না। টাকা আছে, টাকা ছড়াচ্ছি, এই পর্যন্ত।'

'ও কথা বলে আমায় ভোলাতে পারবে না।' অতসী হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'বংশের গুণ কেউ মুছে ফেলতে পারে না। ওরা অকৃতজ্ঞের বংশ। উপকারীকে লাথি মারাই ওদের স্বভাবগত গুণ। নইলে আর সীতু তোমাকে—'

মৃগাঙ্ক ডাক্তার কেমন একরকম করে তাকান, তারপর আস্তে আস্তে বলেন, 'আমার ওপর ওর কৃতজ্ঞ থাকবার কথা নয় অতসী, কদিন ভেবে ভেবে আমি বুঝছি এইটাই আমার ঠিক পাওনা। আমার ওপর ওর ভালবাসা হবে কেন? পশু পাখী কীট পতঙ্গও শত্রু চিনতে পারে। সেটা সহজাত। তুমি জানো না, আমি তো জানি, আমি ওর বাপকে চিকিৎসা করার নামে খেলা করেছি, ইনজেকসনের সিরিঞ্জে শুধু ডিস্টিল্ড ওয়াটার ভরে নিয়ে গিয়েছি—'

'আমি জানি।' অকম্পিত স্বরে বলে অতসী।

'তুমি জানো? তুমি জানো? জানো আমার সেই ছলচাতুরি? অতসী! তবু তুমি—'

'হ্যাঁ, তবু আমি। আমি জানতাম আমার সেই মরণান্তকর দুরবস্থা তোমার আর সহ্য হচ্ছিল না, তাই সেই দুরবস্থার মেয়াদটাকে নিজের চেষ্টায় বাড়িয়ে তোলবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারনি।'

'অতসী! এত দেখতে পেয়েছিলে তুমি? কি করে পেয়েছিলে?'

'তোমার ভালবাসাকে দেখতে পেয়েছিলাম, তাই হয়তো অতটা দেখতে শিখেছিলাম।'

'অতসী! ছেলেটা কাল চলে যাবে। এখন মনে হচ্ছে, হয়তো আর একটু সদ্ব্যবহার করতে পারতাম ওর ওপর! অতটুকু শিশুকে আর একটু ক্ষমা করা যেত!'

'কিন্তু ও...ও তো তোমাকে—'

'ও আমাকে? হ্যাঁ সত্যি, ও আমাকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আমি যে ওর সঙ্গে সমান হয়ে গেলাম, ওর সঙ্গে সমান হতে গিয়েই তো ওর কাছে হেরে গেলাম অতসী! এখন ভাবছি আর একবার যদি চান্স পেতাম, চেষ্টা দেখতাম জিতবার। কিন্তু অনেকটা এগিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'তা হোক, ওতে ওর ভাল হবে।'

এত জিনিস কেন? এত জিনিস কার? কে কাকে দিচ্ছে এসব? ভুরু কুঁচকে দেখে সীতু, কিন্তু কে দিয়েছে এই শিশুটাকে এমন নির্লোভের মন্ত্র?

সীতুর মন্ত্র শুধু 'চাই না'। 'এসব চাই না আমি। কেন দিচ্ছে ও?'

সীতু ভাবে, বোর্ডিঙে থাকতে থাকতে এমন হয় না, সেই স্বপ্নে দেখা ছবি থেকে কেউ এসে নিয়ে চলে যায় সীতুকে! যেখানে এত নিতে হয় না, আর শুনতে হয় না—'এত অকৃতজ্ঞ তুই, এত নেমকহারাম!'

এত জিনিস কেন নেবে সীতু?

কার কাছ থেকে ?

যে লোকটা সীতুর বাবা নয় তার কাছে থেকে ? সমস্ত মন বিদ্রোহ করে ওঠে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না কি করা চলে। বোর্ডিঙেও যে যেতে হবে তাকে।

কে জানে বোর্ডিঙে হয়তো এত সব না থাকলে থাকতে দেয় না, কম কম জিনিস নিয়ে ঢুকতে চাইলে হয়তো বলে, 'চলে যাও, দূর হও !'

লেখাপড়া শিখে সীতু যখন বড় হবে তখন অনেক রোজগার করবে। ওই লোকটার চাইতে অনেক অনেক বেশী। আর সেই টাকাগুলো দিয়ে দেবে ওকে।

আজকাল যেন বড্ড বেশী চুপচাপ হয়ে গেছে লোকটা। সীতুর দিকে আর সে রকম করে তাকায় না।

কিন্তু চুপচাপ থাকবার কি দরকার ? খুব রাগারাগিই করুক না ও, অসভ্যর মত চেঁচামেচি করুক। তাই চায় সীতু। ও যত রাগ করবে, ততই না অগ্রাহ্য করার সুখ !

কেনই বা এত দমে যাচ্ছি আমি ? মৃগাঙ্ক ডাক্তার অবিরতই ভাবতে থাকেন, অতসী তো ঠিক কথাই বলেছে, ছেলের শিক্ষার জন্যে ছেলেকে কাছছাড়া না করছে কে ? এই যে 'ভাবী ভারত নাগরিক আবাস,' যেখানে ভর্তি করছেন সীতুকে, সেখানে তো সীট পাওয়াই দুষ্কর হচ্ছিল, নেহাৎ তাঁর এক ডাক্তার বন্ধু, যে নাকি আবার ওখানকার অধ্যক্ষরও বন্ধু, তার মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে।

আবাস তো খোলা হয়েছে শোনা গেল মাত্র দু' বছর, এর মধ্যেই ছাত্র ধরে না। আর সবই রীতিমত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। তাদের কি কারো মা নেই ? তারা কি সবাই সংসারের জঞ্জাল ? সেই জঞ্জাল সরাবার জন্যেই মাসে তিনশোখানি করে টাকা খরচা করতে রাজী হয়েছে তাদের সংসার ?

তা' তো আর নয়—!

সীতুর বোর্ডিংবাসের ব্যবস্থা একেবারে পাকা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটু যেন নরম হয়েছিল সে, একটু যেন সভ্য। অতসী যখন গম্ভীর বিষণ্ণমুখে ওর জিনিসপত্র গোছায়, সীতুও গম্ভীর গম্ভীর মুখে কাছে বসে থাকে।

বোর্ডিং সম্বন্ধে কি তার আতঙ্ক নেই ? যত প্রবীণ পাকাই হোক, বয়সটা তো আট-নয়।

মার ওপর একটা আক্রোশ ভাব থাকলেও মাকে ছেড়ে যেতে কি তার মন কেমন করছে না ? আর খুকু ? খুকুকে আর দেখতে পাবে না বলে মনের মধ্যে কি যেন একটা তোলপাড় হচ্ছে না কি ?

তাই বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে ভাবে, কত ছেলের বাবা তো বিলেত যায়, বিদেশে চাকরী করতে যায়, অসুখ করে মরে যায়, সীতুর এই বাবাটা কেন ওসবের কিছু করে না?

'বাবা নয়' বলে ঘোষণা করলেও মনে মনে মৃগাঙ্কর ব্যাপারে কিছু ভাবতে গেলে, আর কি ভাবা সম্ভব বুঝে উঠতে পারে না সীতু। তাই মনে মনে বলে, 'এ বাড়ীর বাবাটা যদি মরে যেত, কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেত, ঠিক হতো।'

তাহলে হয়তো সীতু মাকে আবার ভালবাসতে পারতো।

সব প্রস্তুত, বিকেলে চলে যেতে হবে, গাড়ি করেই পৌঁছে দিয়ে আসবেন মৃগাঙ্ক। কতই বা দূর? কলকাতা থেকে মাত্র তো ষোলো মাইল।

মনোরম পরিবেশ, মনোহর ভবন। অতি আধুনিক উপকরণ, আর অতি পৌরাণিক আদর্শবাদ নিয়ে কাজে নেমেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেদিন কথাবার্তা কইতে এসে ভারি ভাল লেগেছিল মৃগাঙ্কর।

পৌঁছে দিয়ে আসবেন আনন্দের সঙ্গে।

আরও আনন্দের হয়, যদি ফিরে আসবার সময় নিঃসঙ্গতার দুঃখ ভোগ না করতে হয়। কাছে এসে বললেন, 'অতসী তুমিও চল না?'

'আমি'! অবাক হয় অতসী, 'আমি কোথা যাব?'

'কেন সীতুকে পৌঁছতে। ঠিক হয়ে থেকো তাহলে, চারটের সময় বেরোব।' মৃগাঙ্ক চলে গেলেন। চুকে যেত সব, যদি না চালে ভুল করে বসতো অতসী।

মনের তার যখন টনটনে হয়ে বাঁধা থাকে, তখন এতটুকু আঘাতেই ঝনঝনিয়ে ওঠে। এটুকু খেয়াল করা উচিত ছিল অতসীর, ঠিক এই মুহূর্তে কথা না কওয়াই বুদ্ধির কাজ হতো। কিন্তু অতসী কথা কইল। বলে ফেললো, 'দেখলি তো খোকা, কত ভাল লোক উনি? তোর জন্যে আমার মন কেমন করছে ভেবে বোর্ডিং পর্যন্ত পৌঁছাতে নিয়ে যেতে চাইছেন। এমন মানুষকে তুই বুঝতে পারলি না? একটু যদি তুই—', হয়তো ছেলের জন্যে মনের মধ্যেটায় হাহাকার হচ্ছে বলেই গলার স্বরটা অমন আবেগে থরথরিয়ে উঠল অতসীর, সেই থরথরে গলায় বলল, 'যদি তুই সভ্য হতিস, ভাল হতিস, এমন করে বাড়ি থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিতে হতো না। সেখানে একা পড়ে থাকতে হবে তো? আর ওঁকেও মাসে মাসে তিনশো করে টাকা দিতে হবে।'

'তিনশো!'

অস্ফুট বিস্ময়ে উচ্চারণ করে ফেলে সীতু। এতটা ধারণা করেনি সে কোনদিন।

কিন্তু থাকতো থাকতো শিশুমনের বিস্ময়। নাইবা বুঝতো সে মৃগাঙ্ক ডাক্তারের মহিমা, কি এসে যেত অতসীর? আবার কেন কথা বললো সে? বোকার মত, ওজন না বোঝা কথা?

'তবে না তো কি? প্রত্যেক মাসে মাসে দিতে হবে। খুব তো বাজে বাজে লোকের

কাছে যা তা কি একটা শুনে চেঁচাচ্ছিলি, 'ও আমার বাবা নয়, কেউ নয়'—নিজের বাবা না হলে কে করে এত ?'

মুহূর্তে কোথা থেকে কি হয়ে গেল, ছিটকে উঠল সীতু। ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আমি চাই না, চাই না বোর্ডিঙে যেতে, দিতে হবে না কাউকে টাকা। সবসময় মিথ্যে কথা বল তুমি। আমি জানি অন্য বাবা ছিল আমার, মরে গেছে সে। আবার বিয়ে করেছ তুমি ওকে।'

না, এ কথার আর উত্তর দেওয়া হ'ল না অতসীর, সীতু ঘর থেকে চলে গেছে।

কিন্তু থাকলেই কি উত্তর দিতে পারতো অতসী ? দেবার কিছু ছিল ?

শুধু বার বার ধিক্কার দিল নিজেকে।

কি জন্যে বলা শক্ত। হয়তো মাত্র একটাই কারণে নয়।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল।

মৃগাঙ্ক সাড়া দিয়েছেন তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিতে।

কাঁটা হয়ে আছে অতসী, কি জানি শেষ মুহূর্তে কি না কি হয় ! নিজে বলতে পারে না, মাধবকে দিয়ে বলায় খোকাবাবুকে পোশাক টোশাক পরে নিতে। আসন্ন বিচ্ছেদবেদনাখানিও বুঝি শুকিয়ে গেছে আতঙ্কের আশঙ্কায়।

কিন্তু না, অতসীর আশঙ্কা অমূলক।

কোন গোলমাল করলো না সীতু, প্রস্তুত হয়ে নিল নির্দেশমত।

মায়ের পিছু পিছু গাড়িতে গিয়ে উঠল।

শহর ছাড়িয়ে শহরতলির পথে গাড়ি ছুটছে দুরন্ত বেগে। অতসীর মনও ছুটছে সেই বেগের সঙ্গে তাল দিয়ে। অন্য পরিবেশে অন্য শিক্ষায় মানুষ হয়ে উঠবে সীতু—সভ্য হবে, মার্জিত হবে, বড় হবে। তখন হয়তো মায়ের প্রতি যা কিছু অবিচার করেছে, তার জন্য লজ্জিত হবে। হয়তো মার প্রতি দয়া আসবে ওর, আসবে মমতা।

পৃথিবীর হালচাল আর দুঃখ দুর্দশা দেখে দেখে নিশ্চয়ই বুঝবে মা তার কত হিতাকাঙ্ক্ষিণী, মা তার কত উপকার করেছে ! তখন হয়তো যাকে আজ বাপ বলে স্বীকার করতে পারছে না, তাকেই শ্রদ্ধা করবে, ভালবাসবে।

কিন্তু অতসী কি অতদিন বাঁচবে ?

সেই সুখের দৃশ্য দেখা পর্যন্ত ?

'এসে গেলাম।' বললেন মৃগাঙ্ক।

সুন্দর কম্পাউণ্ড দেওয়া আবাসিক আশ্রমের গেটের সামনে গাড়ি থামল।

নতুন করে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে অতসীর। কত ভাল মৃগাঙ্ক, কত মহৎ ! নইলে

অতসীর ছেলের জন্যে, যে ছেলে মৃগাঙ্ককে বিষ নজরে দেখে, সেই ছেলের জন্যে, নির্বাচন করেছেন এমন সুন্দর সেরা স্থান!

অধ্যক্ষ এদের অভ্যর্থনা জানালেন। সব কিছু দেখে অতসী সন্তোষ প্রকাশ করছে জেনে ধন্যবাদ জানালেন, কোন ঘরে সীতুর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তা জানালেন। তারপর আফিস ঘরে এসে মৃগাঙ্কর সঙ্গে এটা ওটা লেখালিখি করিয়ে একখানা ছাপা ফরম এগিয়ে দিলেন সীতুর দিকে, 'আচ্ছা এবার তুমি নিজে এই ফরমটা 'ফিল্‌আপ্‌' করতো মাস্টার! এইখানে তোমার নামটা লেখো ইংরেজিতে।'

কলমটা টেনে নিয়ে খসখস করে লিখলো সীতু নিজের নাম।

'বাঃ বেশ হাতের লেখাটি তো তোমার?' অধ্যক্ষ ফরমের আর একটা জায়গায় আঙুল বসালেন, 'এবার এখানটায় বাবার নাম লেখো।'

বাবার!

সহসা পেনের মুখটা বন্ধ করে টেবিলে রেখে দিয়ে সীতু পরিষ্কার গলায় বলে উঠল, 'বাবার নাম জানি না।'

অধ্যক্ষ প্রথমটা একটু ধাক্কা খেলেন, তারপর কি বুঝে যেন মৃদু হেসে বললেন, 'ওঃ, আচ্ছা। আমি বলে যাচ্ছি, তুমি লেখো—'এম আর আই—'

'ও বানান বললে কি হবে? ও তো আমার কেউ নয়। আমার বাবা নেই। মরে গেছে।'

অতসী স্তব্ধ। মৃগাঙ্ক পাথর।

'আশ্চর্য!' ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করেন অধ্যক্ষ, 'তা'হলে ইনি তোমার কে হন?'

'বললাম তো, কেউ না।'

'সীতু! অতসী চাপা আর্তনাদের মত তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'কী অসভ্যতা হচ্ছে? এ রকম করছো কেন? বল সব ঠিক করে, নাম লেখো।'

'কতবার বলবো, আমার বাবার নাম আমি জানি না।'

অধ্যক্ষ ভারি থমথমে মুখে বলেন, 'ডক্টর ব্যানার্জি—'

ডক্টর ব্যানার্জি তাকিয়ে আছেন বাইরের আকাশে দুর্নিরীক্ষ্য দৃষ্টি মেলে।

অতসী উত্তর দেয় ব্যাকুলভাবে, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। থেকে থেকে ওর এ রকম একটা খেয়াল চাপে, তখন—'

'থাক্‌।' অধ্যক্ষ প্রায় ভীষণ গলায় বলে ওঠেন, 'বুঝতে পেরেছি আপনি কি বলতে চাইছেন। কিন্তু এ ধরনের খেয়ালি ছেলেকে আমার এখানে রাখা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আপনি বুঝছেন না'—মৃগাঙ্ক নিঃশব্দ, কথা চালাচ্ছে অতসী, 'ব্যাপার হচ্ছে—'

'দেখুন, আমি হয়তো বুঝি কম। সব রকম ব্যাপার হয়তো বোঝবার মত বুদ্ধি আমার

নেই, কিন্তু বললাম তো আপনাকে, কোনরকম অ্যাব্‌নর্ম্যাল ছেলেকে আমরা রাখতে পারি না। পরীক্ষায় রেজাল্ট ভাল করেছিল, চান্স দিয়েছিলাম। কিন্তু চোখে দেখে…না! মাপ করবেন আমাকে।'

তবু হাল ছাড়তে চায় না অতসী, তবু ধরে রাখতে চায়, তাই বলে, 'সীতু, একী দুষ্টুমি করলে তুমি? দেখতো ইনি কত বিরক্ত হচ্ছেন! কেন ঠিক ঠিক উত্তর দিলে না সব কথার?

'ঠিকই তো দিয়েছি।'

বুক টান টান করে বলে সীতু।

অধ্যক্ষ মৃদুহাসির সঙ্গে বলেন, 'এঁরা তা'হলে তোমার কে হন খোকা?'

'ইনি আমার মা, আর উনি আমার কেউ না।'

মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার, নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছে অতসী। সীতুকে শাসন করবে, এ শক্তিও আর তার কোথাও অবশিষ্ট নেই। একটা কাতর আর্তনাদে যন্ত্রণা প্রকাশেরও শক্তি নেই বুঝি।

নিঃশব্দে আবার সেই শহরতলির পথে ফিরে আসে তিনজনে। পাথরের মূর্তির মত।

শুধু অতসীই বুঝি দূর আকাশের গায়ে দেখতে পেয়েছে আপন অদৃষ্টলিপি। যে আকাশ গোধূলিবেলার সব রং সমস্ত ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে সন্ধ্যার হাতে আত্মসমর্পণ করেছে।

অতসীর ভাগ্যলিপি লেখবার সময় সেই অদৃশ্য লিপিকারের প্রাণটা কি লোহা দিয়ে বাঁধানো ছিল? আর সীতুর ভাগ্যলিপি লিখতে? শুধু হতভাগ্য নয়, শুধু দুঃখী নয়, শুধু নির্বোধ নয়—তার জন্মলগ্নস্থিত গ্রহ তাকে 'মাতৃহন্তা' হতে বলেছে!

অতসী কি শুধু ভালবাসার জন্যেই অকালবৈধব্যকে অস্বীকার করে নতুন জীবনের আলো দেখতে চেয়েছিল? চায়নি সীতুর জন্যেও অনেকখানি?

খাদ্যের অভাবে, যত্নের অভাবে, অস্থিচর্মসার হয়ে যাওয়া ছেলেটাকে বাঁচিয়ে তোলবার বাসনাটাও কি অনেকখানি সাহস জোগায়নি অতসীকে লোকলজ্জা ভুলতে?

কিন্তু আজ?

হ্যাঁ, মনের অগোচর চিন্তা নেই। আজ মনে হচ্ছে—অত দুর্দশার মধ্যেও সেই অস্থিচর্মসার দেহটুকুন টিকে থেকেছিল কি করে?

না টিকলেও তো পারতো।

সেটাই তো স্বাভাবিক ছিল।

এ কি শুধু অতসীর সমস্ত জীবনটা দুঃসহ করে দেবার ষড়যন্ত্রে বিধাতার নিষ্ঠুর কৌশল নয়?

ফেরার পথে গাড়ীতে এক অখণ্ড স্তব্ধতা! মৃগাঙ্কর হাতে ষ্টিয়ারিং কিন্তু সে যেন একটা কলের মানুষ। যে মানুষ অন্য কিছু জানে না, জানে শুধু ওই চাকাখানা ধরে গাড়ীটা এগিয়ে নিয়ে যেতে। ওর রক্ত নেই মাংস নেই। মন, মস্তিষ্ক, চিন্তা, ভাব, কোন কিছুই নেই।

অতসী জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। তার গালের ওপর একটা অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারা। সেটা বাইরের বাতাসে এক একবার শুকিয়ে উঠছে, আবার চোখ উপছে ঝরঝর করে নেমে আসছে নতুন জলের ধারা।

অতসী কখনো কাঁদে না।

সেই অকথ্য অত্যাচারী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সুরেশ রায়ের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়েও কাঁদে নি কখনো। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে, মৌন হয়ে গেছে, পাথর হয়ে গেছে।

ইদানীং সীতুকে নিয়ে নিরুপায়তার এক দুঃসহ জ্বালায় মাঝে মাঝে মাথার রক্ত চোখ দিয়ে নেমে এসেছে। কিন্তু হয়তো সেই শুধু এক ঝলক। তপ্ত ফুটন্ত এক ঝলক জল গালে পড়ে গালের চামড়া পুড়িয়ে দিয়ে মুহূর্তে শুকিয়ে গেছে।

এমন অবিরল অশ্রুধারায় নিজেকে কখনো উজাড় করে দেয় নি। নিঃশেষ করে দেয় নি। আজ বুঝি সংকল্প করেছে অতসী, যা তার প্রাপ্য নয়, তার জন্যে আর প্রত্যাশার পাত্র ধরে থাকবে না।

ভাগ্য তার জন্যে এককণাও বরাদ্দ করে নি। তার ললাটলিপি লেখা হয়েছে চিতাভস্মের কালি দিয়ে। অতসী বৃথাই সেখানে আশা রেখেছে, বৃথাই ভাগ্যের দরবারে আঁচল পেতে বসে থেকেছে এতদিন। আর থাকবে না।

গাড়ী এগিয়ে চলেছে। পরিচিত পথে এসে পড়েছে। এইবার বাড়ীর কাছে বাঁক নেবে। হঠাৎ অতসী গাড়ীর মধ্যে স্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে ওঠে 'আমাদের একটু আগে নামিয়ে দেবে।'

একটু আগে নামিয়ে দেবে!

এ আবার কেমনধারা কথা!

কলের মানুষটা চমকে উঠে ঘাড় ফেরায়। ঘাড় ফেরায় জানলায় মুখ দিয়ে বসে থাকা ছোট মানুষটাও। সীতুও সেই থেকে বাইরে চোখ ফেলে বসে আছে।

তারও এবড়োখেবড়ো দীর্ণ বিদীর্ণ হৃদয়টা ভয়ঙ্কর উত্তাল এক অনুভূতিতে তোলপাড় করছে।

কী হয়ে গেল!

এটা সে কী করে বসল!

কাল থেকেই এই সংকল্প করে রেখেছে বটে সে, কিন্তু তার পরিণামটা তো পরিষ্কার করে ভাবেনি। ওদের সামনে, অন্যলোকের সামনে, মৃগাঙ্ক যে সীতুর কেউ নয় এই সত্যটা উদ্ঘাটন করে দিয়ে মৃগাঙ্ককে একেবারে অপদস্থর একশেষ করে দেবে সীতু, এইটুকু পর্যন্তই

ভাবা ছিল। কিন্তু সেই সংকল্প সাধনের মাশুল দিতে যে অনেক দিনের আশা আর আশ্বাসের বোর্ডিং-বাসটা হারাতে হবে এটা কি করে ভাববে সে?

যতই দুর্মতি হোক তবু শিশু তো!

সীতু ভেবেছিল, ওই ভাবে বাবাকে অপদস্থ করে সে স্কুলের কর্ত্তাকে বলবে, যেহেতু ওই ডাক্তারটা তার বাবা নয়, সেই হেতু সীতেশ তার দেওয়া টাকা নেবে না। ইস্কুল কর্ত্তারা যেন সীতুকে অমনি অমনি না পয়সা নিয়েই এখানে রাখেন। সীতু বড় হলে টাকা রোজগার করে সব শোধ করে দেবে।

কিন্তু সে সব কথা বলবার তো সুবিধেই হ'ল না। আর সত্যি বলতে, সাহসও হল না। বোর্ডিঙের কর্ত্তা যেন মৃগাঙ্কর চাইতেও ভয়ঙ্কর! মুখের দিকে তাকানই যায় না।

বাবা গাড়ীতে উঠতে বললে, 'কিছুতেই তোমার সঙ্গে যাব না, এখানেই থাকবো' বলে মাটিতে শুয়ে পড়বার সংকল্পটাও কাজে পরিণত করা গেল না। আস্তে আস্তে গাড়ীতেই উঠে বসতে হল।

গাড়ী চলছে।

চলছে সীতুর চিন্তার স্রোত।

আচ্ছা, সীতু যদি এই খুকুর বাবাটাকে অপদস্থ করতে না চাইত? যদি বাপের নাম লিখতে বললে ওর নামই লিখত? তাহলে তো আর চলে আসতে হত না?

মৃগাঙ্কর বাড়ী ছেড়ে, অন্য একটা জায়গায়, সুন্দর একটা জায়গায় থাকতে পেত সীতু। কিন্তু? ওই কর্ত্তাটা? ওটা যে বাড়ীর বাবাটার চাইতেও বিচ্ছিরি। তাছাড়া সেই অতসীর সেদিনের কথা!

মাসে মাসে তিনশো টাকা করে পাঠাতে হবে মৃগাঙ্ককে। কেন নেবে সীতু সে টাকা? সীতুর জন্যে অত কিছু চাই না।

এই যে বাড়ীতে?

বেশী কিছু খায় সীতু? মোটেই না। সীতুর জন্যে যাতে মোটেই বেশী খরচা না হয় তা দেখে সীতু। অথচ বোর্ডিঙে থাকলে মা সব সময় ভাববে, ওই বাবাটা সীতুকে কিনে রেখেছে।

কিন্তু আবার সেই বাড়ী!

সেই বামুনদি, নেপ বাহাদুর, কানাই, মোক্ষদা! সীতু যদি গাড়ীর দরজাটা খুলে নেমে পড়ে? অনেকে তো নাকি চলন্ত গাড়ী থেকে নামে। কিন্তু গাড়ী চলতেই থাকে। পেরে ওঠা যায় না।

ঠিক এই সময় হঠাৎ অতসীর গলা কানে এল। অতসী বলছে, 'আমাদের আগে নামিয়ে দেবে।'

ঠিক অনুরোধ নয়, যেন একটা ঠিক করে রাখা ব্যবস্থা, শুধু মনে করিয়ে দেওয়া।

আমাদের মানে কি ?

কাদের ?

মার কথাটা অনুধাবন করতে পারে না সীতু। কিন্তু কথাটা যেন ভয়ঙ্কর একটা আশাপ্রদ। একথা যেন বলছে সীতুকে—আর সেই বামুনদি, কানাই, নেপ বাহাদুরের বাড়ীতে ঢুকতে হবে না।

মৃগাঙ্ক কি বলেন শোনবার জন্যে কান খাড়া করে বসে থাকে সীতু। শুনতে পায়—শান্ত মার্জিত মৃদুগলায় মৃগাঙ্ক বলছেন, 'তোমাদের আগে নামিয়ে দেব। কোথায় নামিয়ে দেব ?'

'যেখানে হোক।' বলছে অতসী, 'দুঃখের মধ্যে, দৈন্যের মধ্যে, রিক্ততার মধ্যে।'

একি ! মৃগাঙ্ক হেসে উঠলেন যে !

কি বলছেন ?

'অত ভাল ভাল জিনিসগুলো এখন চট্ করে কোথায় পাই বলতো ?'

কানকে আরও তীক্ষ্ণ করতে হচ্ছে সীতুকে, কারণ এ রাস্তাটা শহর ছাড়ানো ফাঁকা রাস্তা নয়। শব্দ হচ্ছে আশেপাশে। আর অতসীর কণ্ঠ মৃদু।

'উড়িয়ে দিলে চলবে না।' মৃদু তবু দৃঢ় কণ্ঠে বললে অতসী, 'সীতুকে নিয়ে আর আমি ওবাড়ীতে ঢুকবো না।'

মৃগাঙ্ক বলেন, 'ছেলেমানুষী করে লাভ কি অতসী ?'

'না, না, ছেলেমানুষী নয়', অতসীর মৃদুকণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। 'এ আমার স্থির সংকল্প। তুমি এখন আমাদের এখানে এই শ্যামলীর বাড়ীতে নামিয়ে দাও, তারপর যত শীগগির সম্ভব ছোট একখানা ঘর, যেমন ঘরে আমার থাকা উচিত ছিল, সীতুর থাকা উচিত ছিল, তেমনি একখানা দৈন্যের ঘর জোগাড় করে নেব আমি।'

তবুও মৃগাঙ্কর কণ্ঠে কি বিদ্রূপ ?

সেই বিদ্রূপের কণ্ঠই উচ্চারণ করছে, 'তার পর ?'

'তুমি ব্যঙ্গ কর, উড়িয়ে দিতে চেষ্টা কর, কিন্তু পারবে না। আমার ভবিষ্যৎ আমি স্থির করে নিয়েছি। তারপর—বাঙলা দেশের অসংখ্য নিঃসম্বল মেয়ে যেমন করে নাবালক ছেলে নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে এগিয়ে চলে, তেমনিই করতে চেষ্টা করব।'

'মৃগাঙ্কর গাড়ীর গতি মন্দীভূত হয়েছে, তবু মৃগাঙ্ক পিঠ ফিরিয়েই কথা বলছেন—'ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে এগিয়ে চলে না অতসী, যুদ্ধ করে হারে, যুদ্ধ করে মরে।'

'সেইটাই আমার অদৃষ্টলিপি মনে করব।' মৃত্যুর মত নিষ্ঠুর, মৃত্যুর মত অমোঘ ভঙ্গিতে বলে অতসী, 'মনে করবো তাদেরই একজন আমি। আমার জীবনে কোনদিন দেবতার দর্শন হয়নি, কোনদিন স্বর্গ থেকে আলোর আশীর্ব্বাদ ঝরে পড়েনি। আমি কুষ্ঠব্যাধিতে গলে পচে মরে যাওয়া সুরেশ রায়ের নাবালক পুত্রের রক্ষয়িত্রী মাত্র।...এই যে এসে পড়েছে শ্যামলীর বাড়ী। নামতে দাও আমাদের।'

মৃগাঙ্ক স্থিরভাবে বলেন, 'কি বলবে ওদের ?'

'যা সত্যি তাই বলব। আর বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যার ছলনা দিয়ে খেলার স্বর্গ গড়ব না। গাড়ী থামাও।'

মৃগাঙ্ক গাড়ী থামালেন।

বললেন, 'তোমার হিসেবের খাতা থেকে একটা ছোট্ট হিসেব বোধহয় খসে পড়েছে অতসী! এ পৃথিবীতে খুকু বলে একটা জীব আছে সেটা বোধহয় ভুলে গেছ!'

'না ভুলিনি।' অতসী গাড়ীর জানলার ধারে মাথা রাখে, 'কত শিশুই তো শৈশবে মাতৃহীন হয়, খুকুর জীবনেও তাই ঘটেছে এইটাই ধরে নিতে হবে।'

মৃগাঙ্ক বলেন, 'অর্থাৎ তা'কেও ফেলে দিতে হবে দুঃখের মধ্যে, দৈন্যের মধ্যে, রিক্ততার মধ্যে'! কিন্তু একা আমার অপরাধে এত জনে মিলে কষ্ট পেয়ে লাভ কি? এ মঞ্চ থেকে যদি মৃগাঙ্ক ডাক্তারের অন্তর্ধান ঘটে, তাহলেই তো সব সোজা হয়ে যায়। সুরেশ রায়ের বিধবা স্ত্রীর পরিচয় বহন না করে, না হয় সেই হতভাগ্যের স্ত্রীর পরিচয়েই তার নাবালক সন্তানদের রক্ষয়িত্রী হয়ে থাকলে! অন্ততঃ দুটো শিশুহত্যার পাপ থেকে রক্ষা পাবে।'

অতসী ততক্ষণে নেমে পড়েছে। আঁচলটা মাথায় টেনে নিয়ে বলে, 'সে পাপ থেকে রক্ষা পাবার ভাগ্য নিয়ে সবাই পৃথিবীতে আসে না। খুকুর কোন অভাব হবে না। খুকুর তুমি আছ।'

মৃগাঙ্কও গাড়ী থেকে নেমেছিলেন, তাতে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে অতসীর চোখে চোখ রেখে বলেন, 'তুমি পারবে?'

'মানুষ কি না পারে? মেয়েমানুষ আরো বেশীই পারে।'

'আমার থেকে, খুকুর থেকে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকতে চাও তা'হলে?'

অতসী হতাশ গলায় বলে, 'এখন আমি হয়তো সব কিছু গুছিয়ে বলতে পারব না। তবু এইটুকুই বলছি, সীতুকে সীতুর যথার্থ অবস্থার মধ্যে রাখতে চাই। অহরহ আর বৃথা চেষ্টা, আর ব্যর্থ আশার বোঝা বইতে পারছি না আমি।...সীতু নেমে এস।'

'কোথায় যাবো?'

ক্ষীণস্বরে বলে সীতু।

'সে প্রশ্ন করবার দরকার তোমার নেই সীতু, অধিকারও নেই। ও বাড়ীতে ফিরে যাওয়া তোমার আর হবে না, এইটুকুই শুধু জেনে রাখ।' বলে মৃগাঙ্কর দিকে পূর্ণ গভীর একটি দৃষ্টি ফেলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শ্যামলীর বাড়ীর দিকে এগোয়। সীতুর হাতটা চেপে ধরে।

মৃগাঙ্ক ধীর স্বরে বলেন, 'সীতুর জিনিসপত্রগুলো গাড়ীতে থেকে যাচ্ছে।'

'ও জিনিস সীতুর জন্যে নয়।'

মৃগাঙ্ক এবার ক্ষুব্ধস্বরে বলেন, 'আজ তোমার মনের অবস্থা, চঞ্চল, তাই এমন সব অদ্ভুত

কথা বলতে পারছ। বেশ, আজ রাতটা থাকতে ইচ্ছে হয় থাকো এখানে, খুকুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। রাতে তোমার কাছ ছাড়া হয়ে সে কখনো থাকতে পারে?'

অতসী বোঝে, মৃগাঙ্ক আবার সমস্তটাই সহজ করে নিতে চাইছেন, লঘু করে নিতে চাইছেন। তাই দৃঢ়স্বরে বলে, 'খুকুর মা এইমাত্র মোটর এ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে।'

তবু মৃগাঙ্ক বলেন, 'অতসী, তোমার সিদ্ধান্ত দেখে মনে হচ্ছে, একমাত্র অপরাধী হয়তো আমিই। তাই যদি হয়, আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি।'

অতসী বলে, 'ও কথা বলে আর আমায় অপরাধী কোরনা। শাস্তি যার পাবার, তাকেই পেতে হবে। আর আজ থেকেই তার সুরু। সীতু চল।'

বড় রাস্তা থেকে হাত কয়েক ভিতরে শ্যামলীর বাড়ী। অতসী তার মধ্যে ঢুকে সীতুকে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

মৃগাঙ্ক দাঁড়িয়ে থাকেন।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন।

তারপর গাড়ীতে ওঠেন।

চিরকালের মত একটা কিছু ঘটে গেলো এটা কিছুতেই ভাবা সম্ভব নয়। শুধু ভাবতে থাকেন, খুকুটাকে নিয়ে কি করবেন আজ রাত্রে।

অতসীর ভাগ্যলিপি রচিত হয়েছিল চিতাভস্মের কালি দিয়ে। এই ভয়ঙ্কর সত্যটা টের পেয়ে গেছে অতসী। টের পেয়ে গেছে বলেই নিজের জীবনের চিতা রচনা করল সে নিজেই। জীবনকে বিদায় দিল জীবন থেকে। জোর করে চলে এল ভালবাসার সংসার থেকে। যে সংসারে আরাম ছিল আশ্রয় ছিল, সমাজের পরিচয় ছিল, আর ছিল একান্ত ব্যাকুলতার আহ্বান।

সে সংসারকে ত্যাগ করে চলে এসেছে অতসী, সে ডাককে অবহেলা করেছে ভাগ্যের উপর প্রতিশোধ নিতে। ভাগ্য যদি তাকে সব দিয়েও সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে কৌতুক করতে চায়, নেবে না অতসী সেই কৌতুকের দান।

তুমি কাড়ছ?

তার আগেই আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছি। কি নিয়ে আত্মপ্রসাদ করবে তুমি কর।

কিন্তু অতসীর সব আক্রোশ কি শুধু ভাগ্যেরই উপর? তার প্রতিশোধের লক্ষ্য কি আর কেউ নয়? নয়-আট বছরের একটা নির্বোধ বালক? তার উপরও কি একটা হিংস্র প্রতিশোধ উদগ্র হয়ে ওঠেনি অতসীর?

হ্যাঁ, সীতুর উপরও হিংস্র হয়ে উঠেছিল অতসী।

তাই প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে।

বুঝুক হতভাগা ছেলে পৃথিবী কাকে বলে, দারিদ্র্য কাকে বলে, অভাবের যন্ত্রণা কাকে বলে। সুরেশ রায়ের পরিচয় নিয়ে এই উদাসীন নির্মম পৃথিবীতে কতদিন টিঁকে থাকতে পারে সে দেখুক। সে দেখা তো শুধু চোখের দেখা নয়। প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে দেখা।

অতসী সেই দিনই মরতে পারতো। কিন্তু মরেনি। মরেনি সীতুর জন্যে।

না সীতুর মায়ায় নয়। সীতুকে রক্ষা করবার জন্যেও নয়, মরেনি সীতুর পরাজয় চোখ মেলে দেখবার জন্যে।

তিলে তিলে অনুভব করুক সীতু মৃগাঙ্ক তাকে কী দিয়েছিল, অনুভব করুক মৃগাঙ্ক তার কী ছিল!

সেই রাত্রে অদ্ভুত জিদ করে মৃগাঙ্কর গাড়ী থেকে নেমে পড়েছিল অতসী ছেলেকে নিয়ে। সুরেশ রায়ের ভাইঝির বাড়ীর দরজায়।

কী যেন ভেবে মৃগাঙ্ক আর বেশী বাধা দেননি। অথবা তাঁর ক্লান্ত পীড়িত বিপর্য্যস্ত মন বাধা দেবার শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। হয়তো ভেবেছিলেন 'থাকগে খানিকক্ষণ! হয়তো ছেলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চায়। এই জায়গাটাই যদি অতসী বেশ প্রশস্ত মনে করে থাকে তো করুক।'

তারপর ঘণ্টা দুই পরে একবার গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 'মাইজীকে' নিয়ে আসতে। সে গাড়ী ফিরে গিয়েছিল শূন্যহৃদয় নিয়ে।

'মাইজী আসলেন না।'

মৃগাঙ্ক একটা ভ্রুকুটি করে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে। কাল সবেরমে ফিন্ যানে পড়ে গা। সাত বাজে।'

কিন্তু সকালের গাড়ীও ফিরে এল সেই একই বার্ত্তা নিয়ে।

'মাইজী আয়া নেই! ওহি কোঠিমে—'

মৃগাঙ্ক হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর মৃগাঙ্ক ডাক্তার নিজেই গিয়েছিলেন সুরেশ রায়ের ভাইঝির বাড়ী। বসেছিলেন তার বসবার ঘরে। রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'পাগলামী করো না অতসী, চল।'

অতসীর চোখের সব জল বুঝি কালকেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই অত শুকনো গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'পাগলামী নয়, এটা আমার সিদ্ধান্ত।'

'বৃথা অভিমান করে লাভ কি অতসী? আর কার উপরই বা করছো? আমরা সকলেই ভাগ্যের হাতের খেলনা।'

'অভিমান নয়। কারো ওপর আমার অভিমান নেই, শুধু যে ভাগ্য আমাদের খেলনার মত খেলতে চায়, তার হাত থেকে ছিটকে সরে যেতে চাই। দেখতে চাই সর্বনাশের রূপ কী?'

'সে রূপ তো তোমার একেবারে অজানা নয় অতসী!'

ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন মৃগাঙ্ক।

অতসী বলেছিল, 'ভুল করছ। সুরেশ রায়ের সংসারে আমার শুধু অসুবিধে ছিল, যন্ত্রণা ছিল, জ্বালা ছিল, আর কিছু ছিল না। তাই সুরেশ রায়ের রোগ আর মৃত্যু আমাকে সর্বনাশের চেহারা দেখাতে পারেনি। যা দেখিয়েছিল সে হচ্ছে চিন্তার বিভীষিকা। আর কিছু না। যেখানে কিছু নেই সেখানে সর্বনাশেরও প্রশ্ন নেই।'

পরের বাড়ীতে আড়ষ্ট পরিবেশের মধ্যে আরও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন মৃগাঙ্ক। বুঝি অতসীর স্থির সংকল্পের দৃষ্টির মধ্যে নিজের সর্বনাশের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তাই বলে উঠেছিলেন, 'ইচ্ছে করে সবাই মিলে শাস্তি ভোগ করবার এমন ভয়ঙ্কর সাধ তোমায় পেয়ে বসল কেন অতসী? সীতু কি তোমার রাগের যোগ্য?'

'রাগের কথা নয়।'

'বল তবে কিসের কথা?'

'সে তোমায় বোঝাতে পারব না।'

'বোঝাবার যে কিছু নেই অতসী, কী করে বোঝাবে? হঠাৎ একটা আঘাতে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি অসাড় হয়ে গেছে, তাই এমন একটা আজগুবি কল্পনা পেয়ে বসেছে। চলো বাড়ী চলো। সেখানে মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবো।'

'অদ্ভুত রকমের ঠাণ্ডা আছে মাথা। এই ঠাণ্ডা মাথাতেই ভেবে দেখেছি তোমার ঘরে ফিরে যাবার উপায় আমার আর নেই। সীতুর যা সত্যকার ভাগ্য, যে ভাগ্যকেই ও অহরহ চাইছে, সেই ভাগ্যের মধ্যেই সীতুকে নিয়ে বাস করতে হবে আমাকে।'

'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি অতসী, সীতুর উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি শীগগিরই করে দেব। এখন বুঝতে পারছি ভুলই করেছিলাম। অন্য কোথাও দূর বিদেশে কোনও বোর্ডিঙে ভর্তি করে দেব ওকে, ওর যথার্থ পরিচয় দিয়ে, পিতৃহীন সীতেশ রায় নাম দিয়ে। হয়তো তাতেই ও শান্তি পাবে।'

'না!'

'না?'

'না। তোমার দেওয়া ব্যবস্থায় ওকে মানুষ হয়ে উঠতে দেব না আমি।'

'আমার দেওয়া ব্যবস্থায় ওকে মানুষ হতে দেবে না? অতসী, আমাকে বুঝিয়ে দেবে কি, এ তোমার অহঙ্কার না অভিমান?'

'বলেছি তো অহঙ্কারও নয় অভিমানও নয়। এ শুধু বিচার-বিবেচনার সিদ্ধান্ত। তোমার দেওয়া ব্যবস্থায় মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ আমি দেব না সীতুকে। দুধ কলা আর কাল সাপের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তোমায় সাপের বংশধর, এবার মুক্তি দাও আমায়। সেই একই দৃশ্য আর দেখবার শক্তি আমার নেই।'

'বেশ, আমি ওকে কোন দুঃস্থ ছেলেদের সংস্থায় ভর্তি করে দেব, যেখানে পয়সা লাগে না, ফ্রী সীট।'

অতসী অপলকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'অনাথ আশ্রম?'

এবার মৃগাঙ্ক ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ভয়ঙ্কর একটা চাপা গলায় বলে উঠেছিলেন তিনি, 'যদি তাই-ই হয়। আমার কোন সাহায্যই যদি নিতে না দাও তোমার ছেলেকে, অনাথ আশ্রম ছাড়া আর কোথায় আশ্রয় জুটবে ওর?'

'সে আশ্রয় তো জুটিয়ে দিতে হয় না। অবস্থাই ওকে সে জায়গা জুটিয়ে দিতে পারবে।'

মৃগাঙ্ক এবার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ফেলেছিলেন, 'কুটিল বুদ্ধির মারপ্যাচ শুধু তোমার ছেলের মধ্যেই নেই অতসী. তোমাতেও তার ছোঁয়াচ লেগেছে। সহজ কথা, যুক্তির কথা, বুদ্ধির কথা, কিছুতেই বুঝবে না, এই যেন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছ। যা বলছ তা যে কিছুতেই সম্ভব নয়, এটা যেন চোখ বুজে অস্বীকার করতে চাও। মায়ে ছেলেতে মিলে সব রকমে কেবল আমার মুখ হাসাবে, এমন ভয়ানক প্রতিজ্ঞাই বা কেন তোমাদের? বুঝতে পারছ না কতটা মাথা হেঁট করে এবাড়ীতে আসতে হয়েছে আমাকে! কতটা—'

অতসী বাধা দিয়ে বলেছিল, 'বুঝতে পেরেছি বলেই তো এইখানেই তার শেষ করে দিতে চাইছি। চাইছি মাথা হেঁটের পুনরাবৃত্তি আর যাতে না হয়।'

'চমৎকার! তুমি এইখানে পরের বাড়ীতে বাস করবে এতে আমার মুখ খুব উজ্জ্বল হবে?' বলেছিলেন মৃগাঙ্ক। অতসী হেসেছিল।

হ্যাঁ, হেসেই বলেছিল অতসী, 'তাই কখনো ভাবতে পারি আমি? না তাই থাকতে পারি? থাকবো এখানে নয়, হয়তো বা এদেশেও নয়। তোমার চোখ থেকে, তোমার জীবন থেকে নিজেকে একেবারে মুছে নিয়ে সরে যাবো।'

লোহাও গলে বৈকি!

তেমন তাপে গলে।

মৃগাঙ্ক ডাক্তারের চোখ দিয়েও জল পড়ে।

'আমার জীবন থেকে নিজেকে মুছে নিয়ে সরে যাবে, এ কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে অতসী?'

'পারলাম তো!'

'হ্যাঁ পারলে তো! তাই দেখছি। আর কত সহজেই পারলে! কিন্তু অতসী, শুধু আমার চোখ থেকেই নিজেকে মুছে ফেলতে নয়, নিজের মন থেকেও নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলতে চাইছ যে, তুমি কেবলমাত্র মৃত সুরেশ রায়ের ছেলের মা নও, খুকুরও মা!'

'তার উত্তর তো কালই দিয়েছি। লোকের তো মা মরে। খুকুর মত অনেক বাচ্চারও মা থাকে না। খুকুরও মা থাকবে না। ধরে নাও খুকুর মা মরে গেছে।'

'চমৎকার! চমৎকার তোমার প্রব্‌লেম্ সল্‌ভ করার ক্ষমতা। কিন্তু তবুও প্রশ্নের জের থেকে যায় অতসী,' মৃগাঙ্ক ডাক্তার তিক্ত ব্যঙ্গের সুরে বলেন, 'শেষ হয় না। ভুলে যেও না তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। সুরেশ রায়ের বিধবাকে প্রলোভিত করে এমনি নিয়ে এসে আটকে রাখিনি আমি। আইনতঃ তোমার ওপর আমার জোর আছে। যা খুসি করবার স্বাধীনতা তোমার নেই।'

অতসী আবার হেসে বলে. 'জোর খাটাবে?'

'যদি খাটাই?'

'তবে তাই দেখ।'

'অতসী, এত নিষ্ঠুর তুমি হলে কি করে? তোমার ওই নিষ্ঠুর নির্দয় ছেলেটা কি তোমাকে এমনি করেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে? এখন কি মনে হচ্ছে জানো অতসী, সুরেশ রায়ের সেই রোগা পাক্কাটির মত ছেলেটাকে আমি বাঁচতে দিয়েছিলাম কেন? কেন কৌশলে শয়তানের জড়কে শেষ করে দিইনি।'

না অতসী রেগে যায়নি, কেঁদেও ফেলেনি, বরং হাসির মত মুখ করেই বলেছিল, 'এর চাইতে আরও অনেক বেশী কঠিন কথা বললেও আমি তোমায় দোষ দেব না।'

'অতসী, তোমায় হাত জোড় করে বলছি, পাগলামী ছাড়ো। রাগের মাথায় যা মুখে আসছে বলছি, ক্ষমা করতে পারো কোরো। না পারলে কোর না। দোহাই তোমার, এখন অন্ততঃ বাড়ী চলো। তারপর—'

'ও কথা তো আগেও বলেছ। কিন্তু আমায় মাপ করো।'

মৃগাঙ্ক ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'না। কিছুতেই আমি তোমাকে মাপ করবো না। কিছুতেই তোমার পাগলামীর তালে চলবো না। জোরই খাটাবো। পুলিশের সাহায্যে নিয়ে যাবো তোমাকে। এদের নামে চার্জ আনবো, আমার স্ত্রী-পুত্রকে দুরভিসন্ধির বশে আটকে রেখেছে।'

অতসী তবুও হেসেছিল।

বলেছিল 'তা তুমি পারবে না আমি জানি।'

'জানো? জানো বলে এত সাহস তোমার? তুমি আমার কতটুকু জানো অতসী? ক'দিন তুমি দেখেছ আমায়?

'তবে ডাকো পুলিশ।'

বলে স্থির হয়ে বসে থেকেছিল অতসী।

তারপরেও অনেক কথা বলেছিলেন মৃগাঙ্ক, অনেক সাধ্য সাধনা করেছিলেন। এমন কি এও বলেছিলেন, অতসী যদি মৃগাঙ্কর সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চায়, তো সে ব্যবস্থাও করে দেবেন মৃগাঙ্ক। চেম্বারে থাকবেন তিনি, নয়তো অন্যত্র কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করে নেবেন। অথবা অতসীকেই দেবেন আলাদা ফ্ল্যাটে থাকার সুযোগ। তবু

আজ এদের বাড়ী থেকে চলুক অতসী। সুরেশ রায়ের ভাইঝিকে একান্ত আত্মীয় বলে আঁকড়ে ধরে থেকে এমন করে মৃগাঙ্কর গালে কালি না মাখায় যেন।

কিন্তু অতসী টলেনি। শুধু কথা দিয়েছিল এবাড়ীতে ও আর বেশীক্ষণ থাকবে না। ঘণ্টা কয়েক পরেই চলে যাবে।

'কোথায় যাবে? ছেলেকে গলায় বেঁধে গঙ্গায় ডুবতে?' বলেছিলেন মৃগাঙ্ক। অসহিষ্ণু হয়ে অস্থির হয়ে বলেছিলেন।

অতসী এত জোর সঞ্চয় করলো কখন?

কোথায় পেল এত সাহস, এত মনোবল? কী করে পারলো এর পরেও অটল থাকতে?

'তা' আত্মহত্যাও তো করে মানুষ। ধরে নাও এও তাই।'

'সীতুকে একবার ডেকে দেবে আমার কাছে? আমার ভাগ্য দেবতার সেই নিষ্ঠুর পরিহাসের কাছে, আমার জীবনের সেই শনির কাছে একবার হাত জোড় করি আমি!'

'ছিঃ একথা ভেবোনা। তুমি কি ভাবছ শুধু সীতুর জন্যেই আমার এই সংকল্প? তা ভাবলে ভুল হবে। এ আমার নিজের জন্যেও। দেখছি ভাগ্যের কাছে আমার যা প্রাপ্য পাওনা নয়, তাই জোর করে পেতে গিয়েই ভাগ্যের সঙ্গে এত সংঘর্ষ। আমি তো তোমার জীবনে বেশীদিন আসিনি, মনে করো সেই আগের জীবনেই আছো তুমি। আমি কোন দিনই—'

'খুকুটাকে গোড়া থেকেই হিসেবের বাইরে রাখছ এইটাই এক অদ্ভুত রহস্য বলে মনে হচ্ছে অতসী! আশ্চর্য্য! তোমার মাতৃস্নেহধারা কি শুধু ওই একটা জায়গায় এসেই জমাট হয়ে থেমে গেছে, আর এগোতে পারে নি? খুকু কি তোমার সন্তান নয়? নাকি ওকে তুমি মনের বৈধ সন্তান বলে গ্রহণ করতে পার নি? অবৈধর পর্য্যায়ে রেখে দিয়েছ?'

অতসী কি সত্যিই ওর চোখ দুটোকে আর মনটাকে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলেছিল, তাই একথার পরও একেবারে শুকনো খটখটে চোখে তাকিয়ে বলতে পেরেছিল, 'বলেছি তো যত কঠিন কথাই তুমি বল, দোষ তোমায় দেব না আমি।'

তারপর?

তারপর চলে এসেছে অতসী এইখানে।

শিবপুর লেনের একটা জরাজীর্ণ পচাবাড়ীর একতলার একখানা ঘরে। শ্যামলীর বর অনুরোধে পড়ে বাধ্য হয়ে এ জায়গা খুঁজে জোগাড় করে দিয়েছে।

সেদিন শ্যামলী অবাক বিস্ময়ে কথা খুঁজে পায়নি। বোবার মত তাকিয়ে ছিল ফ্যালফ্যাল করে। অতসীই আশ্বাস দিয়ে ওর সাড় এনেছিল। বলেছিল, 'জীবনের রহস্য অপার শ্যামলী! সে কারো কাছে আসে বন্ধুর বেশে, কারো কাছে আসে রুদ্রের বেশে। তার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, পাথরে নিষ্ফল মাথা কোটার সামিল। জীবনের পঙ্কিল রূপ দেখেছি, সুন্দর রূপও দেখেছি, এবার দেখবো ভয়াবহ রুদ্রের মূর্ত্তিটা কেমন।'

'তার মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই কাকীমা! হাজার হাজার মানুষ আমাদেরই আশেপাশে সেই রুদ্রের অভিশাপ মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছে। রোগে ওষুধ নেই, পেটে ভাত নেই—'

'একটু ভুল করছিস শ্যামলী! ওটা তো হচ্ছে কেবলমাত্র অভাবের চেহারা, দারিদ্র্যের চেহারা। আমার সমস্যা আলাদা। আমার জন্যে খোলা পড়ে আছে আশ্রয় আরাম স্বাচ্ছন্দ্য, কিন্তু ভাগ্য আমাকে তা নিতে দেবে না—'

হঠাৎ রেগে উঠেছিল শ্যামলী। বলে উঠেছিল, 'ভাগ্য না হাতী! নিজের জেদেই আপনি—' রাগ রাখতে পারেনি, কেঁদে ফেলে বলেছিল, 'নইলে আট ন'বছরের একটা ছেলের দুষ্টুমীকে এত বড় করে দেখার কোন মানেই হয় না! ডাক্তার কাকাবাবুর মত মানুষকে আপনি ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, এ আমি ভাবতেই পারছি না—'

'ছিঃ শ্যামলী, ভুল করিস না!'

'ও আপনার ভুল-ঠিক বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই কাকীমা! কিছু নয়, এ আমারই ভাগ্য। হঠাৎ কাছাকাছির মধ্যে আপনাকে পেয়ে গিয়ে বর্ত্তে গিয়েছিলাম কি না, সেটা ভাগ্যে সইল না।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সীতুর আচরণে শ্যামলীকেও হার মানতে হয়েছিল। বোর্ডিং থেকে নেমে সেই যে সীতু শ্যামলীদের একটা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল, পুরো দু'দিন তাকে সেখান থেকে মুখ তোলানো যায়নি। অস্নাত, অভুক্ত, এমন কি জল পর্যন্ত না খেয়ে পড়ে থাকা কাঠের মত শক্ত ছেলেটাকে বারবার খোসামোদ করে ওঠানর চেষ্টায় হার মেনে হতাশ শ্যামলী বলেছিল, 'এ তো দেখছি বদ্ধ পাগল! একে স্কুল বোর্ডিঙে ভর্ত্তি করবার চেষ্টা না করে পাগলা গারদে ভর্ত্তি করে দেওয়া উচিত ছিল আপনার।'

অতসী বলেছিল, 'এ রকম পাগল ওর বাপ ছিল, ঠাকুর্দ্দা ছিলেন, তারা তো জীবনের শেষ অবধি গারদের বাইরেই রয়ে গেলেন শ্যামলী! কেউ বলে নি ওদের পাগলা গারদে পাঠিয়ে দাও।'

'বলে নি, তাই আজ এই অবস্থা। শেষ অবধি হয়তো আপনাকেই সেখানে যেতে হবে।'

'তা' যদি হয় শ্যামলী, সমস্ত কর্ত্তব্যের বোঝা, সমস্ত বিচার বিবেচনার বোছা মাথা থেকে নামিয়ে হালকা হয়ে বেঁচে যাই। কিন্তু তা' হবে না। তোর কাকীমার স্নায়ু বড় বেশী জোরালো শ্যামলী!'

'তাই অমন ছেলে জন্মেছে।' বলে আর এক দফা কেঁদে ফেলেছিল শ্যামলী।

বোঝা যায় নি সীতু এসব কথা শুনতে পাচ্ছে কি না। মনে হচ্ছিল একটা পাথরের পুতুল শুয়ে আছে। দেড়দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় যখন শ্যামলীর বর শিবপুরের এই ঘরখানা জোগাড় করে সে খবর নিয়ে এসে দাঁড়াল, আর অতসী বলল, 'সীতু ওঠ, আমাদের অন্য জায়গায় যেতে

হবে', তখন দেখা গেল সীতু বলে ওই ছেলেটার শ্রবণেন্দ্রিয় অবিকল বজায় আছে। ভাবলেশ শূন্য মুখে উঠে মায়ের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকল।

শিবপুর লেনের এই ঘরখানাতেও মায়ে ছেলের কাছাকাছি থাকা ছাড়া উপায় নেই, কারণ আটফুট বাই দশফুট এই ভাঙ্গা ঘরখানার মধ্যেই অতসীর এই নতুন জীবনের সমগ্র সংসার। এর মধ্যেই তার খাওয়া শোওয়া থাকার সমস্ত সরঞ্জাম।

হ্যাঁ, মৃগাঙ্ক ডাক্তারের কিছু সাহায্য অতসীকে নিতে হয়েছিল। গলার হারটা আর হাতের চুড়ি কটা তো মৃগাঙ্ক ডাক্তারেরই দেওয়া। ভারী কিছু নয়, ভারী গহনার স্থূলতা অতসীর রুচিতে সইত না, তবু নেহাৎই হালকা ওই আভরণটুকু অতসীর নতুন সংসারের মূলধন।

এখানে ওই নিরাভরণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতেই বুঝি অতসী তার শাড়ীখানাও সীমা-রেখাহীন সাদায় পরিণত করে নিয়েছে। এখানে তার পরিচয় নাবালক সীতেশ রায়ের মা বিধবা অতসী রায়।

তা' সন্দেহের দৃষ্টিতে কেউ তাকায় নি।

এযুগ আগের যুগের মত শ্যেনচক্ষু নয়। এযুগে বাংলা দেশের এমন হাজার হাজার বিধবা মেয়ে আত্মীয়ের আশ্রয় ছেড়ে নাবালক ছেলে নিয়ে জীবন যুদ্ধে নামে।

কিন্তু অতসীর হাতে যুদ্ধের অস্ত্র কই?

বাড়ীওয়ালা গিন্নী মাঝে মাঝে দোতলা থেকে নেমে এসে ভাড়াটের দরজায় দাঁড়ান, সমবেদনা জানান, আর প্রশ্ন করেন, 'ছেলে তোমার ইস্কুলে ভর্ত্তি হয় নি?'

মানুষটা সাদাসিধে স্নেহ-প্রবণ, কৌতূহলের বশে প্রশ্ন করেন না, সহৃদয়তার বশেই করেন। বলেন, 'ওটুকুকে মানুষ করে তুলতে পারলেই তোমার দিন কেনা হয়ে গেল মা, ওকে যাহোক করে মানুষ করে তুলতেই হবে। একদিন এই দুঃখিনী তুমিই 'রাজার মা' হয়ে বসবে, তখন পাঁচটা কনের বাপ তোমার দোরে এসে সাধবে। ছেলের মত জিনিস আর আছে মা? এই যে আমি, তিন তিনটে তো বিইয়েছি, তিনটেই মাটির ঢিপি। এককাঁড়ি খরচ করে বিয়ে দিয়েছি, যে যার আপন সংসারে রাজত্ব করতে চলে গেছে, আমার কথা কত ভাবছে? যাই এই বাড়ীটুকু ছিল কর্ত্তার, তাই 'ঘর ঘর' ভাড়াটে রেখে দিন চলছে। তোমার মেয়ে হয়নি বাঁচোয়া।'

মেয়ে হয় নি!

অতসী কি কেঁপে ওঠে?

অতসীর মুখটা কি পাঙাস হয়ে যায়?

বয়স্থা মহিলা অত বুঝতে পারেন না। তিনি কথা চালিয়ে যান, 'চেষ্টা বেষ্টা করে একটা ফ্রী ইস্কুলে ওকে ভর্তি করে দাও বাছা, আখের ভাবো।'

অতসী একদিন সাহস করে বলে, 'দেবো তো মাসীমা, কিন্তু তার আগে আমাকে তো একটা কাজে কর্মে ভর্তি হতে হবে! হাতের পুঁজি তো সবই—' কথা শেষ করেছিল অতসী ভাববাচ্যে। একটু হাসি দিয়ে।

ঘরে সীতেশের উপস্থিতি কি ভুলে গেছে অতসী? না কি সীতেশের আড়ালে কোন জায়গা নেই বলেই নিরুপায় হয়ে সব কথাই তার সামনে উচ্চারণ করতে বাধ্য হচ্ছে?

ঘরকুনো সীতেশ ঘরেই আছে। ঘরেই থাকে।

হরসুন্দরী দেবীর এই পাঁচ ভাড়াটের বাড়ীতে তার সমবয়সী ছেলের অভাব নেই, কিন্তু সীতেশকে বোধকরি তারা চক্ষেও দেখেনি।

হরসুন্দরী দেবী বলেন, 'বললে যদি তো বলি বাছা, আমিও ক'দিন ভাবছি, নতুন মেয়ে তো কাজ কর্ম কিছু করে না, অথচ ছেলে নিয়ে একলা বাস করতে এসেছে। তো ওর চলবে কিসে? তা' ভাবি, বোধহয় স্বামীর দরুণ কিছু আছে হাতে। এযুগে তো আর ভাই-ভাজ, ভাশুর-ভাসুর বিধবাকে দেখে না মা—'

অতসী শান্ত গলায় বলে, 'আমার ওসব কিছুই নেই মাসীমা। আর স্বামীর টাকাও নেই।' তেমনি নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে একটু হাসে অতসী। খেয়াল করে না জানলায় পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকা ছেলেটার পিঠের চামড়াটা পুড়ে উঠছে কিনা অতসীর এই হাসিতে।

'তা' ভাল! তিন কুলের কেউ কোথাও নেই?'

'নাঃ।'

'হ্যাগা তা ওই যে ছেলেটি ঘর খুঁজতে এসেছিল?'

'ওটি আমার দূর সম্পর্কের ভাসুরঝি জামাই হয় মাসীমা।'

হরসুন্দরী বলেন, 'দূর আর নিকট! যার শরীরে মায়া মমতা আছে, সেই নিকট। ছেলেটির আকার প্রকার তো ভালই মনে হল, কিছু সাহায্য করে না?'

আরক্ত মুখে কোন মতে পাশ ফিরিয়ে অতসী বলে, 'করলেই বা আমি জামাইয়ের সাহায্য নেব কেন মাসীমা?'

'তা বটে, তা বটে।' কথাতেই আছে 'পরদুয়ারী জামাই জাতি, এ দুইয়ের নেই উর্দ্ধগতি—' তা মেয়ে! অপিসে চাকরী বাকরী করবে তা'হলে?'

অতসী মাথা নীচু করে বলে, 'অফিসে চাকরী করার মত বিদ্যে সাধ্যি নেই মাসীমা, ছেলেবেলায় বাপ ছিলেন না, মামার বাড়ী মানুষ, তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন, পড়া-লেখায় তেমন সুযোগ হয়নি।'

'আহা! চিরটা কালই তা'হলে দুঃখ! তোমায় দেখলে কিন্তু বাছা এখনকার পাশটাশ করা মেয়ের ধাঁচে লাগে।'

অতসী একথার আর কি উত্তর দেবে?

হরসুন্দরী বলেন, 'মুখ ফুটে তুমি বললে তাই বলতে সাহস করছি বাছা, কিছু মনে না করো তো বলি—কাজ একটা আছে। মানে আমাকেই একজন বলেছিল, লোক দেখে দেবার জন্যে। আমি তো এ পাড়ায় আজ নেই, চল্লিশ বছর আছি, সবাই চেনে।'

'লোক দেখে দেবার জন্যে—' অস্ফুট কণ্ঠে বলে অতসী, 'কি চান তাঁরা? ঝি?'

'আহা হা ঝি কেন, ঝি কেন।' হরসুন্দরী ব্যস্তভাবে বলেন, 'একটা তালবুড়ি বুড়িকে একটু দেখাশোনা করা। নার্সের হাতের সেবা নেবে না এই আর কি! বুড়ির নাকি সত্তর বছর পার হয়ে গেছে। তবে কিনা বড় মানুষের মা, তাই তারা মাসে একশোর বেশী টাকা দিয়েও লোক রাখতে প্রস্তুত। ছেলের বৌটা মহাপাজী মা, স্বামীকে মুখনাড়া দিয়ে বলবে 'তোমার মার সুবিধে করতে একটা বাইরের লোক এনে, প্রতিষ্ঠা করবে, আর আমি ভাবতে বসবো তার কখন কি চাই, সে কী খাবে, কোথায় থাকবে, কোথায় তার জিনিসপত্র রাখবে। পারবো না, রক্ষে করো। ঠিকে লোক রেখে মায়ের সেবা করাতে পারো, করাও। ব্যস!'

'তা বুড়ির ছেলে অশান্তির ভয়ে তাতেই রাজী, কিন্তু ঠিকে বড় কেউ থাকতে চায় না। বলে সারাদিন রুগীর ঘরে থাকবো তো রাঁধবো বাড়বো কখন? বুড়ির ছেলে তাই বলেছে 'দিন চার পাঁচ টাকা করেও যদি লোক পাই তো রাখবো।' ছেলেটা ভাল, বৌটা দজ্জাল। অবিশ্যি তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই, সে বৌ শাশুড়ীর ঘরের ছায়াও মাড়ায় না। বুড়ি কত কাঁদে। এই তো মা, পয়সা থেকেও কত কষ্ট। তবে হ্যাঁ, এই যে লোক রাখতে চায়, পয়সা আছে বলেই তো? আমার মরণ কালে যে কী দুর্দশা হবে ভগবানই জানে।'

অতসী সান্ত্বনার্থে বলে, 'তখন কি আর আপনার মেয়েরা আসবেন না?'

'আসবে। মায়ের এই ইটকাঠ টুকুর ভাগ বুঝতে আসবে। আর এসে তিন বোনে ঝগড়া করবে 'আমি একা কেন করবো' বলে। মেয়ে সন্তান পরের মাটি দিয়ে গড়া মা! তোমার মেয়ে নেই রক্ষে।'

অতসী কষ্টে গলায় স্বর এনে বলে, 'ওদের সঙ্গে আপনি কথা বলুন মাসীমা, আমি করতে রাজী আছি।'

হরসুন্দরী ইতস্ততঃ করে বলেন, 'অবিশ্যি নার্সের কাজ বলতে যা বোঝায় তার সবই করতে হবে বাছা। তবে কি না জাতে বামুন—'

অতসী দৃঢ়স্বরে বলে, 'জাতে বামুন হোন কায়েত হোন, কিছু এসে যায় না মাসীমা, কাজ করবো বলে যখন প্রস্তুত হয়েছি, তখন সবই করবো।'

হরসুন্দরী সপুলকে বলেন, 'তবে তাদের তাই বলিগে?'

হঠাৎ জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকা ছোট মানুষটা ছিটকে এদিকে মুখ ফিরিয়ে চীৎকার করে ওঠে, 'না বলবে না।'

'বলবো না ?' হরসুন্দরী হকচকিয়ে যান।

'না না! তোমার এখানে আসার এত কি দরকার ?'

'সীতু!'

তীক্ষ্ণ তীব্র গলায় একটি সম্বোধন করে অতসী। যেমন গলায় বোধকরি কোনদিনই সীতুকে ডাকেনি। মৃগাঙ্কর সংসারে সীতুকে নিয়ে অনেক যন্ত্রণা ছিল অতসীর, কিন্তু সীতুকে শাসনের বেলায় কোথায় যেন কাণায় কাণায় ভরা ছিল অভিমানের বাষ্প, তাই কখনো গলায় এমন নীরসতার সুর বাজেনি।

সীতু মাথা নীচু করে ফের জানলায় গিয়ে বসে। যে জানলার সঙ্গে তার অস্ফুট স্মৃতির কোথায় যেন একটা মিল আছে। জানলার ওপিঠটা একটা সরু পচা গলি, বছরে দু'দিন সাফ হয় কি না সন্দেহ, দুদিকের বাড়ীর আবর্জ্জনা পড়ে পড়ে জমা হতে থাকে।

এ বাড়ীতে উঠানের মাঝখানে চৌবাচ্চাও একটা আছে, আর কলের মুখে লাগানো নল বেয়ে জল পড়ে পড়ে সেটা ভরতে থাকে সারাদিনে। সীতুর স্মৃতির সঙ্গে অনেক কিছু মিল আছে এ বাড়ীর।

কিন্তু সীতু ?

সে কি তবে এতদিনে স্থির হয়েছে, সন্তুষ্ট হয়েছে ? তার বিদ্রোহী মন শান্ত হয়েছে ?

এসে পর্য্যন্ত তেমনি এক অবস্থাতেই ছিল সীতু। মা ডেকেছেন 'সীতু খাবে এসো', সীতু নিঃশব্দে উঠে এসে খেয়েছে।

মা বলেছে 'সীতু বেলা হয়ে যাচ্ছে ওঠ, এর পরে আর কলতলা খালি পাবে না', সীতু উঠে গিয়ে সেই পাঁচ শরীকের কলের থেকে মুখ ধুয়ে এসেছে। কোন প্রতিবাদ কোন দিন ধ্বনিত হয় নি তার কণ্ঠ থেকে।

আজ সীতুর গলায় সেই পুরনো তীব্রতা ঝলসে উঠল।

অতসী হরসুন্দরীর দিকে চোখ টিপে ইসারায় বলে 'ওর কথা ছেড়ে দিন, আপনি ব্যবস্থা করুন।'

হরসুন্দরী বোঝেন—বালক ছেলে, মাকে ছেড়ে থাকার কথায় বিচলিত হয়েছে। পরম আনন্দে তিনি চক্রবর্ত্তী গিন্নীর কাছে সুখবর দিতে ছুটলেন। বুড়ি এমনি একটি ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়ের জন্যেই হা পিত্যেশ করে বসে আছে। হরসুন্দরী জোগাড় করে দেওয়ার গৌরবটা নেবেন।

'সারাদিন নর্দ্দমার ধারে বসে বসে স্বাস্থ্যটা নষ্ট করে কোন লাভ আছে ?'

অতসীর এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই সীতু জানলা থেকে নেমে এসে ঘরের প্রায়ান্ধকার কোণে পাতা চৌকিটায় গিয়ে বসে।

অতসী বলে, 'কাল তোমায় স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যাব। হেড্‌মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছি আমি; ওপরের মাসীমার তিনি চেনা লোক, কাজেই ভর্তি হতে বেশী অসুবিধে হবে না। তবে একটি কথা তোমাকে শিখিয়ে রাখছি—সত্যি কথা নয়, মিথ্যা কথা। হ্যাঁ, এখন অনেক মিথ্যা কথা তোমায় শেখাতে হবে আমাকে, বলতে হবে নিজেকে। নইলে কোথাও টিঁকতে পাব না। তুমি বলবে, এর আগে তুমি কোন স্কুলে পড়নি, বাড়ীতে মায়ের কাছে পড়েছ। মনে থাকবে? বলতে পারবে? স্কুলে পড়েছিলে জানতে পারলেই এ স্কুল তোমার পুরনো স্কুলের সার্টিফিকেট চাইবে। জিজ্ঞেস করবে, 'কেন ছেড়ে এসেছ? সেখানের রেজাল্ট দেখি।' তা হলে কি বিপদে পড়বে বুঝতে পারছ? সে স্কুলে তোমার নাম সীতেশ রায় নয়, সীতেশ মজুমদার, তা মনে আছে বোধ হয়? কি কাজের কি ফল তোমাকে বোঝাবার বয়স নয়, কিন্তু তুমি বুঝতে পার, বুঝতে চাও, তাই এত করে বুঝিয়ে শিখিয়ে রাখলাম। আর যা করো করো, দয়া করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট কোর না।

আমিও ভুলে যেতে চেষ্টা করবো রায় ছাড়া আর কোনদিন কিছু ছিলাম আমি, ভুলেও যাবো আস্তে আস্তে। যাক আরও একটা কথা শোনো—পর্শু থেকে আমি মাসীমার দেওয়া সেই কাজে ভর্তি হবো। তোমাকে সকালবেলা স্কুলের ভাতটা মাসীমার কাছেই খেতে হবে। সেই ব্যবস্থাই করেছি।'

'আমি খাবো না।'

সীতেশের গলায় বিদ্রোহ। কিন্তু সে বিদ্রোহে কি আর্দ্রতার ছোঁয়া?

অতসী নরম গলায় বলে, 'খাবো না বললে তো রোজ চলবে না, একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে।'

'তুমি ওপরের বুড়ির কথা শুনলে কেন? ওই বিচ্ছিরি কাজ নিলে কেন?'

অতসী মৃদু হেসে বলে, 'বিচ্ছিরি ছাড়া সুচ্ছিরি কাজ কে আমায় দেবে বল? আমি কি বি, এ, এম, এ, পাশ করেছি? আর কাজ না করলে—'

'না না না তুমি কাজ করবে না। তুমি ঝি হতে পাবে না।'

বলে সহসা জীবনে যা না করে সীতু, তাই করে বসে। উপুড় হয়ে পড়ে উথলে কেঁদে ওঠে।

নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে অতসী, সান্ত্বনা দিতে ভুলে যায়। অমনি করে উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে ভাসাবার জন্যে তার অন্তরাত্মাও যে আকুল হয়ে উঠেছে।

খুকু, খুকু! খুকুমণি! কতদিন তোকে দেখিনি আমি! কী করছিস তুই 'মা মরা' হয়ে গিয়ে! কে তোকে খাওয়াচ্ছে খুকু, কে তোকে ঘুম পাড়াচ্ছে? 'মা মা' করে খুঁজে বেড়ালে কী বলছে তোকে ওরা? 'মা নেই, মা মরে গেছে। মা চলে গেছে, আর আসবে না!' শুনে কেমন করে কেঁদে উঠছিস তুই খুকু সোনা! খুকু তুই কেমন আছিস? খুকু তুই কি আছিস?

হরসুন্দরী প্রতি কথায় বলেন, 'তোমার মেয়ে নেই মা বাঁচোয়া।' নিজের মেয়েদের প্রতি দুরন্ত অভিমানের বশেই হয়তো বলেন, কিন্তু তিনি কেমন করে বুঝবেন তাঁর এই সান্ত্বনাবাক্যে অতসীর বুকের ভিতরটা কী তোলপাড় করে ওঠে, জননী হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা কেমন করে 'ঘাট ঘাট' করে ওঠে।

সারাদিনের বেঁধে রাখা মন রাতে আর বাঁধ মানে না। নিঃশব্দ ক্রন্দনে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলতে চায়।

আলাদা চৌকীতে সীতু।

ঘরে জায়গা কম, এ চৌকী যতটা স্বল্প পরিসর হওয়া সম্ভব ততটা স্বল্প, পাশ ফিরতে পড়ে যাবার ভয়। তবু রাত্রির অন্ধকারে অতসীর মনে হয় যেন তার কোলের কাছে একটা বিশাল শূন্যতা! সেই শূন্যতা অতসীকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে, অদৃশ্য দাঁত দিয়ে অতসীকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইছে।

বুকের মধ্যেটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে। সর্ব্ব শরীরে সেই মোচড়ানির যন্ত্রণা অনুভব করে অতসী। যেন দেহের কোথাও ভয়ঙ্কর একটা আঘাত করতে পারলে কিছুটা উপশম হবে। চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে তার। চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, 'খুকু খুকু, তোর মা নেই। তোর মা মরে গেছে বুঝলি?'

মৃগাঙ্ক কি খুকুকে নিজের কাছে নিয়ে শোন?

ঝাপসা করে এইটুকু শুধু ভাবতে পারে অতসী, এর বেশী নয়। মৃগাঙ্কর কথা ওর থেকে বেশী ভাববার ক্ষমতা অতসীর নেই।

ভয়ঙ্কর ক্ষতের দৃশ্যটা যেমন ঢাকা দিয়ে রাখতে চায় মানুষ, দেখতে পারে না, তেমনি সেই ভয়ঙ্কর চিন্তাটাকে সরিয়ে রাখে অতসী, ঢেকে রাখে আতঙ্ক দিয়ে।

শুধু রাত্রে যখন সীতু ঘুমিয়ে পড়ে, যখন আবছা অন্ধকারে ওর রোগা পাতলা ছোট্ট দেহটাকে একটা বালক মাত্র ছাড়া আর কিছু মনে হয় না, তখন তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতের মত একটা প্রশ্ন অতসীকে কুরে কুরে খায় 'আমি কি ভুল করলাম? আমার কি আরও ধৈর্য্য ধরা উচিত ছিল?'

কিন্তু ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করবার মত অবস্থা কি ঘটে নি?

সকাল হতে না হতেই সমস্ত চিন্তা আর সমস্ত প্রশ্নে যবনিকা টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে হয় মনিব বাড়ী। ছটার মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে না পারলেই অনুযোগ শুরু করে বুড়ি, 'আজ তোমার এত দেরী যে আতুসী? কতক্ষণে মুখ ধোওয়াতে আসবে বলে রাত থেকে দুয়োরের পানে তাকাচ্ছি।' দেরী না হলেও অনুযোগটা তাঁর উদ্যত।

অনিদ্রা রোগীর রাত বড় দীর্ঘ।

সকালের আলোর আশায় পলক গোনে সে।

অতসী তর্ক করে না, প্রতিবাদ করে না, 'এই একটু দেরী হয়ে গেল দিদিমা। উঠুন, মুখ ধুয়ে নিন।' বলে তৎপরতা দেখায়।

তারপর কাজ আর কাজ।

মুখ ধোওয়ানো, বিশুদ্ধ কাপড় পরিয়ে তাঁকে জপ আহ্নিক করতে বসানো, নিজে স্নান করে এসে তবে তাঁকে খাওয়ানো, ওষুধ খাওয়ানো। ঠিক রোগী নয়, বলতে গেলে রোগটা জরা, তবু ওষুধ খেতে ভাল বাসেন চক্রবর্ত্তী গিন্নী। ভালবাসেন সেবা খেতে। তাই হাত খালি হলেই তেল মালিশ করতে হয় বসে বসে। আর বসে বসে শুনতে হয় তাঁর ছেলের প্রশংসা আর ছেলের বৌয়ের নিন্দে। এই শোনাটাও একটা বিশেষ কাজ।

এই কাজ আর অকাজের অবিচ্ছিন্ন ধারার মধ্যে তলিয়ে থাকে চিন্তা ভাবনা। মনে করবার অবকাশ থাকে না অতসী কে, অতসী কি, অতসী এখানে কেন। যেন এই খামখেয়ালি বড়লোক বুড়ির খাস পরিচারিকা, এইটাই অতসীর একমাত্র পরিচয়।

মানুষটা খিটখিটে নয়, এইটুকুই পরম লাভ। মিষ্টিমুখে সারাক্ষণ খাটিয়ে নেন। মালিশ হলেই বলেন, 'অ আতুসী, মালিশের তেলের হাতটা ধুয়ে দুটো পান ছ্যাঁচ দিকি খাই।' পান ছ্যাঁচা হলেই বলবেন 'আতুসী দেখতো বিছানায় পিঁপড়ে হয়েছে না ছারপোকা? চব্বিশ ঘণ্টা কী যে কামড়ায়।'

সন্ধ্যাবেলা সব মিটে গেলে, চলে যাবার সময় পর্যন্ত ডাক দেন, 'আতুসী, মশারীটা ভাল করে গুঁজেছ তো? কাল যেন একটা মশা ঢুকেছিল মনে হচ্ছে।'

আসল কথা সারাক্ষণ একটা মানুষের স্পর্শ আর সান্নিধ্যের লোভ! সংসার যার পাওনা চুকিয়ে দিয়েছে, অবস্থা যাকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে, তার হয়তো এমনিই হয়। মানুষের সঙ্গলালসা, এমনিই চক্ষুলজ্জাহীন করে তোলে তাকে। এই কাজের জগতে বার্দ্ধক্যকে সঙ্গ দেবে এমন দায় কার? তাই ওই সঙ্গ দেওয়াটাই যার ডিউটি, তাকে পুরো ভোগ করে নিতে চান চক্রবর্ত্তী গিন্নী সুরেশ্বরী।

আবার ভাল কথাও বলেন বৈ কি!

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অতসীর জীবন কাহিনী শুনতে চান তিনি, চান 'আহা' করতে। চান অতসীর আত্ম পরিজনকে কটু বাক্যে তিরস্কার করতে। বলেন, 'এই বয়সে, এই ছবির মতন চেহারা, কোন প্রাণে তারা একলা ছেড়ে দিয়েছে; এই যাই ভাল আশ্রয়ে এসে পড়েছ তাই রক্ষে। নইলে কার খর্পরে যে পড়তে!' আবার বলেন, 'ছেলেকে তো কই, একদিন আনলে না আতুসী। দেখতে চাইলাম!'

অতসী বলে, 'আসবে না দিদিমা। বড় লাজুক।'

সুরেশ্বরী বলেন, 'আহা আসতে আসতেই লজ্জা ভাঙবে। আনলে চাইকি আমার আনন্দর নেক নজরে পড়ে যেতে পারে। তখন তোমার ওই ছেলের বই খাতা জুতো জামা

কোন কিছুর অভাব হবে না। আনন্দর যে আমার বড় মায়ার শরীর, গরীবের দুঃখ একেবারে দেখতে পারে না।'

অতসী কাঠের মত শক্ত হয়ে যাওয়া হাতে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে মালিশ চালিয়ে যায়, আর সহসা এক সময় বলে ওঠেন সুরেশ্বরী 'কাজ করতে করতে থেকে থেকে তোমার যে কী হয় আতুসী, যেন কোথায় আছে মন, কোথায় আছে দেহ। একটু মন দাও বাছা। মাস গেলে কম-গুলি করে তো গুণতে হয় না আমার আনন্দকে। শুধু এই বুড়িমার আরাম স্বস্তির জন্যে।'

হ্যাঁ, এটুকু স্পষ্ট কথা তিনি বলেন।

নিজের গৌরব গরিমা বাড়াতেই বলেন।

তা' এটুকু না সইলে চলবে কেন?

উদয়াস্ত খিটখিট করলেই কি সইতে হ'তনা? মনিব খিটখিটে বলে একশো পঁচিশ টাকার চাকরীটা ছেড়ে দিত? তাই কেউ দেয়? ঘরে যার ভাত নেই?

ওদিকে এদিক ওদিক থেকে সুরেশ্বরীর ছেলের বৌয়ের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেলেই তিনি হাতছানি দিয়ে ডেকে সহাস্যে বলেন, 'কেমন কাজ চলছে?'

অতসী মৃদু হেসে বলে 'ভাল'।

'তা ভাল না বলে আর উপায় কি। বলি এক মিনিট বসতে শুতে পাও কোন দিন? ইস তা আর নয়, ওই চীজটিকে আমার জানতে বাকী আছে কি না। চব্বিশ ঘণ্টা খালি ফরমাস আর ফরমাস। বাবাঃ! তা বাপু আমি মুখফোঁড় মানুষ বলে ফেলি। এমন চেহারাখানি তোমার, এমন মিষ্টি মিষ্টি গলা, তুমি মরতে এই অখদ্যে কাজ করতে এলে কেন? সিনেমায় নামলে লুফে নিত।'

অতসী উত্তর দেয় না, শুধু কান দুটো যে তার কত লাল হয়ে উঠেছে সেটা নিজেই অনুভব করে।

ভদ্রমহিলা আবার হেসে হেসে বলেন 'একটা তো ছেলেও আছে তোমার শুনেছি। তোমার মতনই সুন্দর হ'বে নিশ্চয়। মায়ে ছেলেয় নেমে পড়। আজকাল ছোট ছেলের চাহিদা ও লাইনে খুব। হাড়ির হাল থেকে রাজার হাল হবে। নইলে এই দাসীবৃত্তি করে ছেলেকে আর কতই মানুষ করে তুলতে পারবে? তার চাইতে ও লাইনে অগাধ পয়সা।

অতসী মৃদুস্বরে বলে, 'আপনারা হিতৈষী, আপনারা অবিশ্যি যা ভাল তাই বলবেন, দেখব ভেবে।'

হিহি করে হাসেন ভদ্রমহিলা আর বলেন, 'তোমার মতন অবস্থা আমার হলে, ওসব ভাবাভাবির ধার ধারতাম না, কবে গিয়ে হিরোইন হ'তাম। ভাল থেকে হবেটা কী? কেউ তোমায় ভাত দেবে, না সামাজিক মান মর্য্যাদা দেবে?'

ভদ্রমহিলার মতবাদকে অযৌক্তিক বলা যায় না।

না, 'তুমি' ছাড়া 'আপনি' এবাড়ীতে কেউ বলে না অতসীকে। বাসনমাজা ঝিটাও বলে, 'তুমি আবার এখন কলে পড়তে এলে? সরো বাপু, সরো, আমায় বাসন কখানা ধুয়ে নিতে দাও আগে।'

সুরেশ্বরীর চা দুধ খাওয়া পাথরের বাটি গেলাস অতসীকেই মেজে নিতে হয়, সুরেশ্বরীর নির্দ্দেশ। সেই দুটো হাতে করে অপেক্ষা করতে হবে অতসীকে যুগ যুগান্তর, কলের আশায়।

সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে কোনদিন দেখে সীতু আধময়লা বিছানাটায় গুটি সুটি হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কোনদিন দেখে হ্যারিকেনের আলোর সামনে রক্তাভ চক্ষু মেলে পড়া করছে। বেশীক্ষণ পারে না তখুনি গুটিয়ে শুয়ে পড়ে। লাইট নেই।

বারো টাকা ভাড়া ঘরে লাইট থাকে না।

ওই দামে কোঠা ঘর পাওয়া গেছে এই ঢের।

অতসী এসে কাপড় ছাড়ে, হাত পা ধোয়, উনুনে আগুন দিয়ে রুটি তরকারি করে ডাক দেয় 'সীতু ওঠ, খাবার হয়েছে।'

সীতু আস্তে আস্তে উঠে খেতে বসে।

না বসে উপায়ই বা কি?

খিদেয় যে পাকযন্ত্র সুদ্ধ পরিপাক হয়ে থাকে। ইস্কুল থেকে এসে কে হাতের কাছে খাবার জুগিয়ে দেবে?

অতসী মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, 'কৌটায় মুড়ি থাকে, নাড়ু থাকে, পাউরুটি আনা থাকে, কিছু খাস না কেন সীতু?'

সীতু গম্ভীর ভাবে বলে 'খিদে পায় না।'

এমনি করে কাটে দিন আর রাত্রি।

কয়েকটা মাস গড়িয়ে যায়।

সুরেশ্বরী আর একটু অপটু হতে থাকেন। আর সুরেশ্বরীর ছেলের বৌ রোজ একবার করে অতসীকে প্ররোচনা দেন। 'ছেলেকে সিনেমায় না দিলে তোমার কাছে এখানেই নিয়ে এসে রাখ না। সারাদিন তোমার চোখে চোখে থাকবে।

অবশেষে একদিন অতসীকে সুরেশ্বরীর কাছ থেকে আড়ালে ডেকে আসল কথাটা পাড়ে সুরেশ্বরীর ছেলের বৌ, 'কই গো, তোমার ছেলেকে একদিন আনলে না?'

অতসী একবার ওই মদগর্ব্ব মণ্ডিত মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নীচু করে বলে, 'ছেলে লাজুক, আসতে বললে আসতে চাইবে না।'

'বাঃ দিব্যি তো কথা এড়াতে পারো তুমি?' বৌ যেন ঝাঁজিয়ে ওঠে, 'আসতে বললে আসতে চাইবে, কি না চাইবে, আগে থেকেই বুঝছো কি করে?'

অতসী চোখ তুলে মৃদু হেসে বলে, 'ছেলে কি চাইবে না চাইবে মায়ে বুঝতে পারে বৈকি।'

'হুঁ।' ভদ্রমহিলার মুখখানি থমথমে হয়ে ওঠে। বোধ করি তার সন্দেহ হয় শাশুড়ীর নাসের এটি তার সন্তানহীনতার প্রতি কটাক্ষপাত। কিন্তু এখন একটি মতলব নিয়ে তার কথা সুরু করেছে সে, প্রথম নম্বরেই মেজাজ দেখিয়ে কাজ পণ্ড করলে লোকসান। তাই আবার কষ্টে মুখে হাসি টেনে বলে, 'আহা, বেড়াতে আসার নাম করে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসবে একদিন। মানুষের বাড়ী মানুষ বেড়াতে আসে না?'

অতসী কষ্টে মৃদু হেসে বলে, 'তা' একদিন নিয়ে এলেই বা লাভ কি?'

যাক আলোচনাটা অনুকূলে আসছে, বৌ হৃষ্ট হয়ে ওঠে। মুচকি হেসে বলে, 'একদিন থেকেই চিরদিন হয়ে যেতে পারে, আশ্চর্য্য কি?'

অতসী একথার অর্থ গ্রহণে অক্ষম হয়েই বোধকরি চুপ করে চেয়ে থাকে।

সুরেশ্বরীর ছেলের বৌ, যার নাম নাকি বিজলী, সে ঠোঁটের কোণে একটু বিজলীর চমক খেলিয়ে বলে ওঠে, 'তুমি বাপু বড় বেশী সরল, কোন কথা যদি ধরতে পারো। বলছিলাম তুমি তো ওই হরসুন্দরী বামনীর ভাড়াটে। যা বাহারের বাড়ী তার, দেখেছি তো! সেই ভাঙা ঘরেরও কোন না পাঁচ সাত টাকা ভাড়া নেয়, সেখানে ওই ভাড়া গুণে নাই বা থাকলে? এখানে আমার এতবড় বাড়ী, নীচের তলায় কত ঘরদোর পড়ে, ছেলে নিয়ে অনায়াসে এখানে এসে থাকতে পারো।'

'তাই কি আর হয়!' বলে কথায় যবনিকা টেনে চলে যেতে উদ্যত হয় অতসী। কিন্তু বিজলী তাকে এখন ছাড়তে রাজী নয়, তাই ব্যগ্রভাবে বলে, 'দাঁড়াও না ছাই একটু। বুড়ি আর তোমাবিহনে এক্ষুনি গলা শুকিয়ে মরছে না। 'তাই কি আর হয়' বলছ কেন? এতে তো তোমারই সুবিধে, আর—' গলা খাটো করে বিজলী আসল কথায় আসে, 'দুদিক থেকেই তোমার হাতে কিছু পয়সা হয়। ঘর ভাড়াটা বাঁচে, আর তোমার ছেলে যদি বাবুর ফাই-ফরমাসটা একটু খাটতে পারে তাতেও পাঁচ সাত টাকা—'

হঠাৎ যেন সমস্ত পৃথিবীটা প্রবল বেগে প্রচণ্ড একটা পাক খেয়ে অতসীকে ধরে আছাড় মারে। সেই আছাড়ের আকস্মিকতা কাটতে সময় লাগে। কথা বলবার শক্তি সংগ্রহ করতে দেরী হয়। ততক্ষণে বিজলী আর একটু বিদ্যুৎ হাসি হেসে বলে, 'বাবুর যা দিলদরিয়া মেজাজ, হাতে হাতে খুরে মন জুগিয়ে চলতে পারলে বখশীসেই—'

হ্যাঁ, এতক্ষণে শক্তি সঞ্চয় হয়েছে।

অতসী ঝাঁ ঝাঁ করা কান আর জ্বালা করা চোখ দুটো নিয়েও কথা বলতে

পেয়েছে। কিন্তু সে কথা শুনে মুহূর্তে বিজলী বজ্র হয়ে ওঠে। তীব্রস্বরে বলে, 'কী বললে? ভবিষ্যতে যেন আর কখনো এ ধরনের কথা না বলি? তেজটা তোমার একটু বেশী নার্স! বলি আমার বাড়ীতে থেকে ছেলে যদি তোমার ঘরের ছেলের মত একটু কাজ কর্ম করতো, মানের কানা খসে যেত তার? তবু তো তুমি পাশ করা নার্স নও। মা যার দাস্যবৃত্তি করছে, তার ছেলের এত মান! বাবাঃ! কিন্তু এটি জেনো নার্স, এত মান নিয়ে পরের বাড়ী কাজ করা চলে না। মান একটু খাটো করতে হয়।'

অতসী এতক্ষণে স্থির হয়ে গেছে। স্বাভাবিক রং ফিরে পেয়েছে ওর চোখ আর কান।

সেই স্থির চেহারা নিয়ে ও বলে, 'আপনার আর কিছু বলবার আছে? যদি থাকে তো বলে নিন।'

বিজলী এবার বোধকরি একটু থতমত খায়, তবু থতমত খেয়ে চুপ হয়ে যাবার মেয়ে সে নয়। তাই ভুরু কুঁচকে বলে, 'আর যা বলবার আছে, সেটা বাবুকে বলবো, তোমাকে নয়। কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে বাস করা যায় না। এটা মনে রেখো।'

'মনে রাখবো।'

বলে চলে এসে অতসী যথারীতি সুরেশ্বরীকে ওষুধ খাওয়ায়। মালিশ করে দেয়। তারপর সহজ শান্তভাবে বলে, 'বিকেল থেকে আমি আর আসবো না দিদিমা!'

'তার মানে? আসবে না মানে?' নেহাৎ অপটু তাই, নইলে বোধকরি ছিটকেই উঠতেন সুরেশ্বরী, 'আসবে না বললেই হ'ল?'

'তা আসতে যখন পারবো না, তখন বলে যাওয়াই তো ভাল।'

'বলি পারবে না কেন বাছা সেইটাই শুধোই। বুঝেছি বুঝেছি, আমার ওই বৌটি নিশ্চয় ভাঙচি দিয়েছে। ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই শলা-পরামর্শই দিল তা'হলে এতক্ষণ? বলি তুমি তো আর হাবার বেটি নও? শুনবে কেন ওর কথা? বুঝছো না আমার ওপর হিংসে করে তোমায় ভাঙচি দিচ্ছে? এই যে তুমি আমায় যত্ন আত্তি করছ, দেখে হিংসেয় বুক পুড়ছে ওর। মহা খল মেয়েমানুষ মা, মহা খল মেয়েমানুষ! কান দিও না ওর কথায়।'

অতসী গম্ভীর ভাবে বলে, 'বৃথা ওসব কথা বলবেন না দিদিমা, উনি আমায় যেতে বলেন নি। আমার অসুবিধে হচ্ছে।'

'তাই বল—' সুরেশ্বরী সহসা একগাল হেসে বলেন, 'বুঝেছি। চালাকের বেটির আরও কিছু বাড়ানোর তাল। তা' বলবো আমি, ছেলেকে বলবো। বলে কয়ে সাড়ে চার টাকা রোজ করে দেব তোমার। তাতে হবে তো? হবে না কেন, মাস গেলে পনেরোটা টাকা তো বেড়ে গেল। তা হ্যাঁ মা আতুসী, একথা মুখ ফুটে একটু বললেই হতো। দেখছ যখন তোমাকে আমার মনে ধরেছে। না বাছা ছাড়ার

কথা মুখে এনো না। এই বুড়ি যেকটা দিন আছে, থেকো। আমি প্রাতর্বাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার ভাল হবে।'

অতসী বৃদ্ধার ওই উদ্বিগ্ন আটুপটু, আবার প্রায় নিশ্চিন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। মনে ভাবে 'একের অপরাধে আরের দণ্ড!' পৃথিবী জুড়ে তো এই লীলা! আমি আর কি করবো? বুড়ির জন্যে মায়া হচ্ছে, কিন্তু উপায় কি! এখানে আর থাকা যায় কি করে?

সুরেশ্বরী তাঁর ছানিপড়া চোখের দৃষ্টি যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ করে অতসীর মুখের দিকে তাকান এবং সে মুখে অনমনীয়তার ছাপ দেখে বিগলিত কণ্ঠে বলেন, 'তা' ওতেও যদি তোমার মন না ওঠে, পাঁচ টাকা রোজই করিয়ে দেব বাছা। আর তো মন খুঁত খুঁত করবে না? কিন্তু তাও বলি আতুসী, আমার ছেলে খুব মাতৃভক্ত, আর টাকার দুখদরদ নেই বলেই এতটা কবুল করতে সাহস করলাম আমি। নইলে এ তল্লাটে এর অর্দ্ধেক দিয়েও কেউ বুড়ো মায়ের সেবার জন্যে লোক রাখতে চাইবে না। বৌটি হারামজাদা হয়েই হয়েছে আমার কাল। তুই ডাণ্ডা খাণ্ডা বাঁজা মানুষ, শাশুড়ীর সেবা করতে পারিস না? সোয়ামীর এতগুলো করে টাকা জলে যাচ্ছে, তাই দেখছিস বসে বসে? কী বলবো আতুসী, জলে পুড়ে মলাম, জলে পুড়ে মলাম।'

অতসী মৃদুস্বরে বলে, 'দুঃখ যন্ত্রণার বিষয় বেশী আলোচনা না করাই ভাল দিদিমা, ওতে কষ্ট বাড়ে ভিন্ন কমে না।'

সুরেশ্বরী সহসা বিগলিত স্নেহে অতসীর হাতটা চেপে ধরেন, বলেন, 'এই দেখতো মা, এই জন্যেই তোমায় ছাড়তে চাই না। কথা শুনলে বুক জুড়োয়। আর আমার বৌটি! কথা নয় তো, যেন এক একখানি চেলা কাঠ! যাকগে বাছা, তুমি মনকে প্রফুল্ল করো, দিন পাঁচ টাকা করেই পাবে।'

অতসী দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'পাঁচ টাকা দশ টাকার কথা নয় দিদিমা, দিন কুড়ি টাকা করে হলেও আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব হবে না।'

সুরেশ্বরী স্তম্ভিত বিস্ময়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বলেন, 'বুঝেছি, ওই হারামজাদী তোমায় কোনও অপমানের কথা বলেছে। আচ্ছা ডাকাচ্ছি ওকে আমি একবার। দেখি কী তোমায় বলেছে? যতই হোক তুমি হলে ভদ্দর ঘরের মেয়ে, তোমাকে একটা মান অপমানের কথা বললে তো গায়ে লাগবেই। কে যাচ্ছিস রে ওখানে? নন্দ? তোদের বৌদিদিকে একবার ডাক তো।'

অতসী ব্যাকুল ভাবে বলে, 'মিথ্যে কেন এসব মনে করছেন দিদিমা? আমি বলছি উনি কিছু বলেন নি। আমারই থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এমনিই হচ্ছে না। আগে বুঝতে পারি নি—'

সুরেশ্বরী হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠে বলেন, 'আগে বুঝতে পারনি বলে আমায় তুমি গাছে তুলে মই কেড়ে নেবে? এই যে আমার সেবার অভ্যেসটি ধরিয়ে দিলে, তার কি?'

সুরেশ্বরীর অভিযোগের ভাষা শুনে এত যন্ত্রণার মধ্যেও হাসি পেয়ে যায় অতসীর। প্রায় হেসে ফেলে বলে, 'ও আর কি, যে থাকবে, সেই করবে। এত এত টাকা দিলে এক্ষুনি লোক পেয়ে যাবেন।'

সুরেশ্বরী নিজের আগুনে নিজেই জল ঢালেন।

কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, 'লোক পাবো না তা বলছি না। লোক পাবো। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই। কিন্তু মা আতুসী, সব কাকই যে দাঁড়কাক। যারা আসবে, তারা হয় একেবারে ঝি চাকরাণীর মতই নোংরা ইল্লুতে ছোটলোক হবে, নয় হাসপাতালের নার্সদের মত গ্যাড্ ম্যাড্ ফ্যাড্ হবে। তোমার মতন এমন সভ্য ভব্য শান্ত ভদ্দর মেয়ে আমি আর কোথায় পাবো শুনি?'

অতসী চুপ করে থাকে আর ভাবে, ভেবেছিলাম মনকে পাথর করে ফেলেছি, মমতাকে জয় করেছি। কিন্তু দেখছি বড্ড বেশী ভাবা হয়ে গিয়েছিল।

সুরেশ্বরী আবার ভাবেন, মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। অতসীর বোধ হয় মন ভিজছে। তাই আকুলতার মাত্রা আর একটু বাড়ান তিনি। আবার হাত ধরেন, চোখের জল ফেলেন, অতসীকে কাজের শেষে সকাল সকাল ছেড়ে দেবেন বলে শপথবাক্য উচ্চারণ করেন, তার ফাঁকে ফাঁকে নিজের বৌ সম্পর্কে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' করেন। কিন্তু অতসী অনমনীয়। মমতাকে সে জয় করতে পারে নি সত্যি, কিন্তু ওইটুকুই, তার বেশী নয়। মমতায় বিগলিত হয়ে সংকল্পচ্যুত হবে, সে এমন দুর্বল নয়।

অনুরোধ, উপরোধ?

তাতে টলানো যাবে অতসীকে? যদি তা যেত, অতসীর ইতিহাস অন্য হতো।

অতসী চলে এল।

শেষের দিকে সুরেশ্বরী রাগ করে গুম হয়ে রইলেন। অতসী নিঃশব্দে চলে এল। বিজলী দোতলার বারান্দা থেকে দেখল। আর একই সঙ্গে বিপরীত দুই মনোভাবে কেমন বিচলিত হলো।

অতসী এসে পর্যন্ত সুবিধা হয়েছিল তা'র অনেক, সুরেশ্বরী যতই গালমন্দ করুন এবং নিজে সে যতই বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে শোনাক শাশুড়ীকে, তবু শাশুড়ী সম্পর্কে একটা দায় তা'র ছিল, অতসী এসে পর্যন্ত সেই দায়টা ঘুচেছিল। আবার সেই দায়টা ঘাড়ে এসে পড়বে এই ভেবে মনটা বিরস হচ্ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই একটা হিংস্র পুলকে ভাবছিল—ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে, বুড়ি জব্দ হবে।

কিন্তু আশ্চর্য! ভাল বলতে গিয়ে মন্দ হওয়া!

ছেলেকে চাকর রাখায় আপত্তি!

বেশ বাপু আপত্তি তো আপত্তি। তোমার ছেলে না হয় জজ ম্যাজিস্ট্রেটই হবে, তুমি লোকের বাড়ী পা টিপে আর কোমরে তেল মালিশ করে ছেলেকে রূপোর খাটে বসিয়ে মানুষ করগে, কিন্তু দুম্ করে চাকরীটা ছেড়ে দেবার দরকার কি ছিল?

এতই যদি তেজ, তো পরের বাড়ী খাটতে আসা কেন?

এই ভাবে যুক্তি সাজিয়ে বিজলী নিজেকে দোষমুক্ত এবং অতসীকে দোষযুক্ত করে তুললো, কিন্তু তবু তেমন নিশ্চিন্ত হতে পারল না।

স্বামী এসে কী বলবেন?

মায়ের আবার পুনর্মূষিক অবস্থা দেখে খুসি নিশ্চয় হবেন না এবং সন্দেহ নেই বিজলীকেই এ ঘটনার নায়িকা মনে করবেন।

তাই করে লোকটা। সব সময় করে।

বলে না কিছু, কিন্তু নীরব থেকেও শুধু চোখ মুখের ভাবে বুবিয়ে ছাড়ে, সব দোষ বিজলীর।

আর সুরেশরী?

তিনি বিশ্ব সংসারের সকলকে শাপশাপান্ত করছেন, এমন কি হরসুন্দরীকেও রেহাই দিচ্ছেন না।

জেনে শুনে এরকম নিষ্ঠুরপ্রাণ মেয়ে মানুষকে সে কোন হিসেবে দিয়েছিল?

হরসুন্দরীকে সামনে পেলে আরও যে কী বলতেন তিনি!

অতসী অবশ্য বাড়ী এসে কিছুই বলল না।

সামনের ঘরের পড়শীনি চোখোচোখি হ'তে বললেন, 'দিদি যে আজ এক্ষুনি।'

অতসী বলল, 'এমনি! চলে এলাম।'

সীতু তখনও স্কুল থেকে আসে নি, ঘরের দরজায় একটা সস্তা দরের তালা ঝুলছে। এ ব্যবস্থা হরসুন্দরীর নিজের। ভাড়াটের ভালমন্দের দায়িত্ব তাঁরই, এই বোঝেন তিনি। কিছু যদি চুরি যায়, তাঁর বাড়ীরই বদনাম হবে।

কিন্তু অতসীর কি চুরি যাবে?

কি আছে তার?

তালার চাবিটা নিতে দোতলায় উঠতেই হ'ল তাকে। হরসুন্দরী অবাক হয়ে বললেন, 'এমন সময় যে?'

অতসী একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'কাজ ছেড়ে দিয়ে এলাম।'

'কাজ ছেড়ে দিয়ে এলে?' হরসুন্দরী আঁতকে ওঠেন, 'কেন গো? বুড়ি হয়ে গেল নাকি?'

'না না, কী আশ্চর্য্য, তা' কেন? এমনিই।'

হরসুন্দরী হাঁ করে তাকিয়ে বলেন, 'এমনি! ঘরে তো অন্নভক্ষ্য ধনুর্গুণ, এমনি তুমি কাজটা—ছেড়ে দিলে? বুড়ি খুব খিটখিট করেছিল বুঝি?'

'না না, কিছুই বলেন নি তিনি।'

'তবে ওই বৌ ছুঁড়ি ক্যাটকেটিয়ে কিছু বলেছে নিশ্চয়! ওর কথাই অমনি। দেখনা শাশুড়ী পর্যন্ত জ্বলেপুড়ে মরে। তবু বলি, রাগের মাথায় ঝপ করে চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে আসা তোমার উচিত হয় নি মেয়ে! এ জগৎ বড় কঠিন ঠাঁই।'

অতসী আস্তে চাবিটা কুড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তর তর করে চলে আসতে পারে না।

হরসুন্দরী আবার বলেন, 'বুঝছি, তোমার কপালে এখন অশেষ দুঃখ তোলা আছে। নইলে অমন কাজটা ছেড়ে দিলে! আর কোথাও কিছু জোগাড় করেছ নাকি?'

অতসী ক্ষুব্ধ হাসি হাসে, 'আমি আর কোথায় কি জোগাড় করবো?'

'তা'ও তো সত্যি। কিন্তু এও বলি অতসী, ঝোঁকের মাথায় কাজটা ছেড়ে না দিয়ে একবার বাড়ী এসে বিবেচনা করা উচিত ছিল। পরের দাসত্ব করতে গেলে গায়ে গণ্ডারের চামড়া পরতে হয় মা!'

'সেটা পরতে সময় লাগবে মাসীমা!'

বলে অতসী চলে আসতে যায়। হরসুন্দরী বাধা দিয়ে সন্দিগ্ধ ভাবে বলেন, 'শাশুড়ীও কিছু বলেনি বলছ, বৌও কিছু বলেনি, তবে ব্যাপারটা কী হল বলত? বুড়ির ছেলেকে তো ভাল বলেই জানতাম, সেই কোন রকম কিছু বেচাল দেখাল নাকি?'

'আঃ ছি ছি! কী বলছেন মাসীমা।'

অতসী রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'কী করে যে এই সব আজগুবি কথা মাথায় আসে আপনাদের!' বলেই চলে আসে, আর দাঁড়ায় না।

স্কুল থেকে ফিরে সীতু কোনদিন মাকে বাড়ীতে দেখতে পায় না। অতসী আসে সন্ধ্যার পর। আজ ঘরের দরজা খোলা দেখে ঈষৎ বিস্ময়ে দরজায় উঁকি দিয়েই পুলকে রোমাঞ্চিত হল সে। তার 'সীল' করা মনও এই পুলককে লুকিয়ে রাখতে পারল না।

বই রেখেই মার কাছাকাছি বসে পড়ে উজ্জ্বল মুখে বলে উঠল সীতু, 'মা এখন?'

অতসী কী এই উজ্জ্বল মুখে কালি ঢেলে দেবে? বলবে, 'ঘুচিয়ে এলাম চাকরী? এবার নেমে আসতে হবে দুর্দশার চরমে?'

না, এই মুহূর্তে তা পারল না অতসী। শুধু মৃদুহেসে বলল, 'দেখে বুঝি রাগ হচ্ছে?'

'ইস রাগ বৈ কি! রোজ তুমি থাকবে। ইস্কুল থেকে এসে তালা খুলতে বিচ্ছিরি লাগে।'

অতসী তেমনি ভাবেই বলে, 'বেশ, রোজ আমি থাকবো, তোকে আর দরজার তালা খুলতে হবে না। কিন্তু রোজগারের ভার তুই নিবি তো?'

না, কালি ঢেলে দেওয়া বন্ধ করা গেল না। সুর কেটে গেল।

সীতু আস্তে আস্তে উঠে গেল মুখ হাত ধুতে।

কিন্তু নিজে ছাড়লেও 'কমলি' ছাড়ে না।

পরদিন হরসুন্দরী এসে জাঁকিয়ে বসলেন, 'শুনলাম বাছা তোমার কাজ ছাড়ার কারণ কাহিনী।'

অতসী অনুভব করল সীতু হেঁটমুণ্ডে অঙ্ক কসতে কসতেও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি বলল, 'থাক মাসীমা ও কথা।'

কিন্তু হরসুন্দরী তো এসেছেন দূত হয়ে, কাজেই এক্ষুনি 'থাকলে' তাঁর চলবে কেন? তাই প্রবল স্বরে বলেন, 'তুমি তো বলছ বাছা থাক ও কথা। কিন্তু তারা যে আমায় আবার খোসামোদ করছে। বুড়ি তো মা আমার হাতে ধরে কেঁদে ভাসাল। শুনলাম সব। বৌটা না কি তোমার ছেলেকে বাবুর ফাইফরমাস খাটতে চাকর রাখতে চেয়েছিল? অহঙ্কার দেখ একবার! তুমি না হয় অভাবে পড়ে দাসীবিত্তি—'

মুখের কথা মুখেই থাকে হরসুন্দরীর, হঠাৎ সীতু থাতা ফেলে উঠে এসে তীব্র চীৎকারে বলে, 'তুমি চলে যাও।'

একে 'তুমি' তায় 'চলে যাও'।

হরসুন্দরীর আগুন হয়ে উঠতে পলক মাত্রও দেরী হয় না।

তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'তোমাদের মায়ে বেটার তেজটা একটু বেশী সীতুর মা! কপালে তোমার দুঃখু আছে। আচ্ছা চলে আমি যাচ্ছি। ঠিক ঠিক সময়ে ঘরভাড়াটা জুগিও বাছা, তোমার ছায়া মাড়াতেও আসবো না। আত্মজন ছেড়ে কেন যে তুমি ওই ছেলে নিয়ে অকূলে ভেসেছ, বুঝতে পারছি এবার।'

হরসুন্দরী বীরদর্পে চলে যান।

অতসীর অকূলের তৃণের ভেলা, অসময়ের একমাত্র হিতৈষী হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালী।

অতসী কি ছুটে গিয়ে ওই ভেলাকে আঁকড়ে ধরবে? বলবে, 'জানেনই তো মাসীমা, ছেলে আমার পাগলা।'

না অতসীর সে শক্তি নেই। ছুটে যাওয়ার শক্তি। স্থানু হয়ে গেছে সে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, নির্বাক দুটো প্রাণী বসে থাকে সেই অন্ধকারে। এমনি করেই কি লেখাপড়া চালাবে সীতু? মানুষ হবে, বড়লোক হবে? মৃগাঙ্ক ডাক্তারের অর্থঋণ শোধ করবে?

হঠাৎ এক সময় অতসী পিঠে একটা স্পর্শ অনুভব করে। একটা চুলে ভরা মাথা আর হাড় হাড় রোগা মুখের স্পর্শ।

'ও কেন ওকথা বলবে?' রুদ্ধ অস্ফুট স্বর।

অতসী নির্বাক।

আর একবার সেই রুদ্ধস্বর বলে ওঠে, 'আমার বুঝি বিচ্ছিরি লাগে না?' আপোসের স্বর, কৈফিয়তের স্বর।

অতসী স্থির স্বরে বলে, 'পৃথিবীর কোনটা তোমার বিচ্ছিরি লাগে না, সেটা আমার জানা নেই সীতু। নতুন করে আর কি বলবে?'

'চাকর বললে, দাসী বললে, চুপ করে থাকবো?'

'হ্যাঁ থাকবে।' অতসী দৃঢ় স্বরে বলে, 'তাই থাকতে হবে। আমারই ভুল হয়েছিল

কাজ ছেড়ে আসা। ঠিকই বলেছিল ওরা। আমাদের অবস্থার উপযুক্ত কথাই বলেছিল। অহঙ্কার আমাদের শোভা পাবে কিসে? জানো, একমাস যদি এ ঘরের ভাড়া দিতে না পারি, রাস্তায় বার করে দিতে পারেন উনি। জানো, জেনে রাখো! এসব জানতে হবে তোমায়। জেনে রাখো তোমার বিচ্ছিরি লাগা আর ভাল লাগার বশে, পৃথিবী চলবে না।' অতসী যেন হাঁফাতে থাকে, 'কাল থেকে আবার আমি ওখানে কাজ করতে যাবো। পায়ে ধরে বলবো, আমার ভুল হয়েছিল—'

'না না না !'

বাণ খাওয়া পশুর মত আর্ত্তনাদ করে ওঠে বাক্যবাণ বিদ্ধ ছেলেটা।

আশ্চর্য, এত নিষ্ঠুর কি করে হল অতসী?

না কি ছেলেকে চৈতন্য করিয়ে দিতে ওর এই নিষ্ঠুরতার অভিনয়? অভিনয় কি এত তীব্র হয়? না কি অহরহ খুকুর মুখ তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে দিচ্ছে?

ওই আর্ত্তনাদে একটু সামলায় অতসী। একটু চুপ করে থাকে। তারপর সহজ গলায় বলে, 'না, তো চলবে কিসে তাই বল?'

'নাই বা চলল?' সীতু তেমনি একগুঁয়ে স্বরে বলে, 'আমরা দু' জনেই মরে যাই না?'

অতসী উঠে দাঁড়ায়, যথাসম্ভব দৃঢ় স্বরে বলে, 'কেন? মরে যাব কেন? মরে যাওয়া মানেই হেরে যাওয়া তা' জানো? হারতে চাও তুমি? যদি হেরেই যাবো, তা হলে তো ও বাড়ীতেই মরতে পারতাম। এ খেয়ালকে মনে আসতে দিও না সীতু! মনে রেখো তোমায় বাঁচতে হবে, জিততে হবে। দেখাতে হবে, যে অহঙ্কার করে চলে এসেছ, সে অহঙ্কার বজায় রাখবার যোগ্যতা তোমার আছে।'

উঠে গিয়ে উনুন ধরাতে বসে অতসী।

কিন্তু ক'দিন উনুন ধরাবে?

কোথা থেকে আসবে রসদ?

কী করে কি করছে ওরা?

কী করে চালাচ্ছে?

কোথা থেকে আসছে ওদের রসদ?

এই কথাটাই আকাশপাতাল ভাবেন মৃগাঙ্ক ডাক্তার। ভাবেন সত্যিই কি এইভাবে ভেসে যেতে দেবেন ওদের?

না, অতসীর আস্তানা এখন আর তাঁর অজানা নেই। অনেকদিন ভেবে ভেবে অবশেষে মাথা হেঁট করে শ্যামলীর বাড়ী গিয়ে সে খোঁজ করে এসেছেন। যদিও অতসীর সহস্র নিষেধ ছিল, তবু শ্যামলী বলতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করে নি। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিল,

'লজ্জায় আমি আপনার কাছে মুখ দেখাতে পারি না কাকাবাবু, না হলে কবে গিয়ে বলে আসতাম। আমি বলি কি, আপনি আর ওঁদের জেদের প্রশ্রয় দেবেন না। এবার পুলিশের সাহায্য নিয়ে জোর করে ধরে এনে বাড়ীতে বন্ধ করে রেখে দিন। আবদার নাকি, ওই ভাবে একটা বস্তির বাড়ীর মত বাড়ীতে থেকে আপনার মুখ পোড়াবে?'

বোকাদের মুখরতা মৃগাঙ্কর অসহ্য, তবু সেদিন ওই বোকা মেয়েটার মুখরতা অসহ্য লাগে নি। সহসা মনে হয়েছিল, জগতে এই সরল সাদাসিধে অনেক-কথা-বলা লোক কিছু আছে বলেই বুঝি পৃথিবী আজও শুকিয়ে উঠে জলে পুড়ে খাক হয়ে যায় নি। ভেবেছিলেন, আশ্চর্য, মেয়েটার ওপর এত বিরূপই বা ছিলাম কেন!

'তোমরা কোনদিন গিয়েছিলে?'

সসঙ্কোচে প্রশ্ন করেছিলেন মৃগাঙ্ক।

শ্যামলী মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'উপায় আছে? একেবারে কড়া দিব্যি। দেখা করব না, খোঁজ করব না, কোন সাহায্য করবো না—'

'সাহায্য' শব্দটা উচ্চারণ করে অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গিয়েছিল শ্যামলী। চলে এসেছিলেন মৃগাঙ্ক। চলে তো আসতেই হবে। নিতান্ত কাজ ব্যতীত বাইরে থাকার জো আছে কি? 'খুকু' নামক সেই ভয়ঙ্কর মায়ার পুতুলটা আছে না বাড়ীতে? সারাক্ষণ যাকে ঝি চাকরের কাছে পড়ে থাকতে হয়। মৃগাঙ্ক এলেই যে কোথা থেকে না কোথা থেকে ছুটে এসে 'বাব্‌বা বাব্‌বা' বলে ঝাঁপিয়ে কোলে ওঠে।

শুধু ওই 'বাবা' ডাকেই চিরদিন সন্তুষ্ট থাকতে হবে খুকুকে। 'মা' বলতে পাবে না। মা নেই ওর। হঠাৎ একদিন মোটর এ্যাকসিডেন্টে মা মারা গেছে ওর।

বাবাই তাই বুকের ভেতরে চেপে ধরে খুকুকে।

কিন্তু থাকে না। বেশীদিন থাকে না এই অভিমান। থাকানো যায় না।

গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যান মৃগাঙ্ক।

শিবপুরের এক অখ্যাত গলির ধারে কাছে ঘুরে বেড়ান। একদিন নয়, অনেক দিন। কিন্তু কী যে হয়, কিছুতেই সাহস করে গাড়ী থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সেই বাই-লেনের ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে যেতে পারেন না। বুকটা কেমন করে ওঠে। পা কাঁপে।

যদি অতসী পরিচয় অস্বীকার করে বসে।

যদি অন্য পাঁচজনের সামনে বলে ওঠে, 'আচ্ছা লোক তো আপনি? বলছি আপনাকে চিনি না আমি—'

চলে আসেন।

আবার যখন গভীর রাত্রে ঘুম থেকে জেগে ওঠা কান্নায় উদ্দাম খুকুকে কিছুতেই ভোলাতে না পেরে, কোলে নিয়ে পায়চারি করে বেড়ান, তখন মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করেন, 'কাল নিশ্চয়ই।' কিন্তু আবার পিছিয়ে যায় মন।

এই 'কাল কাল' করে কেটে যায় কত বিনিদ্র রাত, আর অশান্ত দিন।

তারপর সেদিন।

যেদিন খুকু—

কিন্তু এমন কি হয় না? ডাক্তার হয়েও এত বেশী নার্ভাস হলেন কি করে?

হয়তো অত বেশী নার্ভাস হয়ে উঠেছিলেন বলেই খুকু—

সেদিন অপদস্থ হয়ে ঘরে গিয়ে রাগে ফুঁসে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হরসুন্দরী, 'রোসো! ঝেঁটিয়ে বিদেয় করছি। ও মা আমি গেলাম তোদের ভাল করতে, আর তোরা কি না! পুঁচকে ছোঁড়াটা যেন কেউটের বাচ্চা!'

আসল কথা দু'দিকে জ্বালা হল তাঁর।

হঠাৎ অতসী কাজটা ছেড়ে আসায় সন্দেহাকুল মনে গিয়েছিলেন তল্লাস নিতে, ভেবেছিলেন খুব একটা কিছু ঘটে গেছে বোধহয়।

কিন্তু, এমন আর কি!

হ্যাঁ, বুঝলাম ভাল ঘরের মেয়ে। ছেলেটাকে মানুষ করে তোলবার জন্যে শরীর পতন করতে বসেছে, চাকর রাখা কথাটা ভাল লাগেনি। তা' বলে ঝপ্ করে কাজটা ছেড়ে দিবি?

সুরেশ্বরী হাত ধরে কেঁদেছিলেন।

'তুমি যেমন করে পারো তাকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে নিয়ে এসো বাপু। সেবার হাতটি তার বড় ভাল। এমনটি আর পাবো না। আর যে আসবে, সেই তো হবে কি না কি জাত। এমন ভাল জাতের মেয়ে—'

হরসুন্দরী ভেবেছিলেন, অনুরোধ উপরোধের জাল ফেলে মাছকে টেনে তুলবেন।

উপরোধে ঢেঁকি গেলান যায়, আর এতো ছানার মণ্ডা। অভাবের জ্বালায় মান অভিমান কতক্ষণ থাকে? নিজের ওপর আস্থা ছিল হরসুন্দরীর।

বলেই এসেছিলেন সুরেশ্বরীকে, 'আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বাঝিয়ে নিয়ে আসবো আবার। উপরোধের মতন উপরোধ করতে জানলে ঢেঁকি গেলান যায় লোককে, আর এতো গিয়ে ছানার মণ্ডা। ভাল ঘরের মেয়ে তো, হঠাৎ মান অপমান বোধটা বেশী।'

কিন্তু এখন তাদের কী বলবেন? উপরোধ করার স্পৃহা তো আর নেই হরসুন্দরীর।

ওই ঢেঁটা ছেলেটা তার চিত্ত বিষ করে দিয়েছে। তাই একমনে দিন গুনছেন তিনি মাসকাবারটা কবে হয়। কবে ভাড়া না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকার দায়ে ওই আঝাড়া বাঁশ দু'খানাকে ঘরছাড়া করেন।

গরীবের উপকার করতে বুক বাড়িয়ে দেওয়া যায়, যদি গরীব গরীবের মত নত থাকে। গরীবের অহঙ্কার অসহ্য!

হরসুন্দরী মাস কাবার পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে আছেন, কিন্তু অতসীর যে দিন কাটে না। তার স্বল্প সঞ্চয় ভাঁড়ারের সব কিছুই তো শেষ হয়ে গেছে। কাল পর্যন্ত চালটা ছিল, আজ তাও নেই।

চাল নেই!

মৃগাঙ্ক ডাক্তারের স্ত্রী চালের শূন্য কলসীটার সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে মৃগাঙ্ক ডাক্তারের স্ত্রী কাঁদবে? না হেসে লুটিয়ে পড়বে?

কলসীটা নেড়ে নাচাতে নাচাতে এসে বলবে, 'ওরে সীতু কী মজা! আজ আর বেশ রান্না করতে হবে না। বেশ কেমন যত ইচ্ছে ঘুমাবো মজা করে।'

হ্যাঁ, সেই কথাই বলতে গিয়েছিল অতসী।

সত্যিই কলসীটা হাতে করে গিয়েছিল।

নাচাতে নাচাতে বলেওছিল, 'ওরে সীতু আজ কী মজা! আজ আর রাঁধতে হবে না আমায়—'

কিন্তু এত হাসি যে কোথা থেকে এল অতসীর?

প্রগল্‌ভ প্রবল হাসি!

সেই হাসির ধমকে মাটির কলসীটা হাত থেকে ছিটকে গড়িয়ে ভেঙেই পড়ল একদিকে। আর অতসী লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এক ঝাঁক স্কুলের মেয়ে একত্রে থাকলে যেমন করে তুচ্ছ কথায় হেসে লুটোপুটি খায়, একা অতসী তেমনি লুটোপুটি খাবে না কি?

এই হাসির দিকে তাকিয়ে আতঙ্কবিহ্বল একজোড়া দৃষ্টি যেন পাথর হয়ে তাকিয়ে থাকে।

আর ঠিক এই সময় হরসুন্দরী দরজায় এসে দাঁড়াল, তাঁর বড় মেয়েকে নিয়ে!

মহিলা দুটি ঘরের সম্পূর্ণ দৃশ্যটি একবার যাকে বলে অবলোকন করে গালে হাত দিয়ে বিস্ময় বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'হ্যাঁ গা ব্যাপার কি! ও খোকা, মা পড়ে গিয়ে কাৎরাচ্ছে না কি গো!'

'খোকা' অবশ্য এক ডাকে কথা কয় না, এখনো কইল না।

হরসুন্দরী এগিয়ে এসে বলেন, 'অ সীতুর মা, কাৎরাচ্ছো কেন? কলসীটাই বা ভেঙে গড়াগড়ি যাচ্ছে কেন, মায়ে ছেলের মুখে রা নেই যে।'

এবার ছেলে 'রা' কাড়ে।

স্বভাবগত তীব্র স্বরে বলে 'কাৎরাবেন কেন? হাঁসছেন।'

'হাঁসছেন!'

মা মেয়ে দু'জনে বোধকরি হাঁ করে হাঁ বন্ধ করতে ভুলে যান।

কিন্তু অতসী উঠে পড়ছে না কেন? কেন উঠে পড়ে বলছে না, 'বোকাটার কথা শুনছেন কেন মাসীমা! হঠাৎ পেটটা বড্ড ব্যথা করছে বলে!...ওই ব্যথার দাপটেই হাত থেকে কলসীটা পড়ে গিয়ে—'

না অতসী উঠছে না। মাটিতে মুখ গুঁজেই পড়ে আছে সে। শুধু দেহটা যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল সেটা স্থির হয়ে গেছে।

হরসুন্দরী যদিও নিজের মেয়েদের সম্পর্কে সর্বদাই বিদ্বেষবাক্য উচ্চারণ করেন, কিন্তু আপাতত দেখা গেল মায়ে ঝিয়ে একতার অভাব নেই। মেয়েও অবিকল মায়ের ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়ে বলে, 'হঠাৎ এত হাসির কি কারণ ঘটল যে গড়াগড়ি দিয়ে হাসতে হচ্ছে? সিদ্ধি খেয়েছ না কি গো অতসী?'

তোমরা সব্‌বাই এত অসভ্য কেন?' সীতু স্বর আরও তীব্র করে, 'কলসীতে চাল নেই, রাঁধতে হবে না বলে মা হাসছেন! সিদ্ধি! সিদ্ধি মানুষে খায়? শুধু তো দ্বারোয়ানরা খায়।'

সহসা মাতা কন্যা চুপ করে যান এবং পরস্পর একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়। আর মিনিট খানেক তাকিয়ে থেকে হরসুন্দরীর চোখে যে আলোটি ফুটে ওঠে, সেটি প্রেমেরও নয়, করুণারও নয়, স্রেফ্ জয়োল্লাসের।

সেই আলোঝরা চোখে বলে ওঠেন হরসুন্দরী, 'তোমাদের রঙ্গলীলা তোমরাই জানো। ঘরে চালের দানা নেই, মেজাজ চালে মট্‌মট! এই অবধি বুড়ি কী খোসামোদটাই করল আমাকে! তোমাদের মতিগতি দেখে আর বলে অপমান্যি হলাম না! এতদিনে তারা হতাশ হয়ে অন্য লোক রাখল। যাক গে মরুক গে! ভেতরের কথা তোমরাই মায়ে পোয়ে জানো। আমার কথা বলে যাই। ভাড়া না দিয়ে ভাড়াটে পুষি এমন সঙ্গতি আমার নেই। মাসের আর দু'দিন আছে, এর মধ্যে অন্য ব্যবস্থা করে ফেল, পয়লা থেকে আমার মেয়ের ভাগ্নী এসে থাকবে। এর যেন আর নড়চড় না হয়।'

দুম দুম করে চলে আসেন দু'জনে। কিন্তু দোষ হরসুন্দরীকে দেওয়া যায় না। অসহায়া বিধবাকে দেখে মায়া তাঁর পড়েছিল। ওদের যাতে ভাল হয় তার চেষ্টাও কম করেন নি। কিন্তু মায়া যে নেয় না, ভাল যে চায় না, তার ওপর কতক্ষণ আর কার চিত্ত প্রসন্ন থাকে?

তার উপর আজকের এই পরিস্থিতি।

বলতে এসেছিলেন অবিশ্যি বাড়ী ছাড়ারই কথা। কিন্তু রয়ে বসে আর একবার শেষ

চেষ্টা দেখে বলবেন ভেবেছিলেন। ও মা এ আবার কী ঢং! ঘরে চাল নেই, রান্নার ছুটি বলে আহ্লাদে গড়াগড়ি দিয়ে হাসছে! হয় পাগল, নয় তলে তলে অন্য ব্যাপার! হয়তো আসলে গরীব নয়, ঘর ভেঙে পালিয়ে টালিয়ে এসেছে। আবার হয়তো ফিরে যাবে। তবে আর মায়া করার কী দরকার?

মেয়ে বলে, 'তুমি মোটেই আশা কোর না মা, যাবে। ও দেখো, ঠিক ঘর কামড়ে পড়ে থাকবে।'

হরসুন্দরী থমথমে গলায় বলেন, 'নাঃ, সেদিকে তেজ টনটনে। ছেলের হাত ধরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াবে, তবু মচকাবে না।'

হ্যাঁ, হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালী চিনেছিলেন অতসীকে। মানুষ চেনবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

'এই তালাচাবিটা রইল মাসীমা, ঘরটা ধুয়ে রেখে গেলাম।' বলে ভাঙা নড়বড়ে সেই তালাটা হরসুন্দরীর কাছে নামিয়ে দিয়ে একটা নমস্কারের মত করে অতসী।

হরসুন্দরী নীরস গলায় বলেন, 'আশ্রয় একটা জোগাড় করেছ, না তেজ করে ছেলের হাত ধরে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াচ্ছ?'

অতসী ঈষৎ হেসে বলে, 'আপনাদের আশীর্ব্বাদই আশ্রয় মাসীমা, উপায় হবেই যাহোক একটা কিছু।'

হরসুন্দরী নিশ্বাস ফেলে চাবিটা কুড়িয়ে নিয়ে বলেন, 'ধর্মে মতি থাক, ছেলেটা মানুষ হোক। তবে এও বলি অতসী, তোমার যত দুর্গতি ওই ছেলে থেকেই। ওর চেয়ে এক গণ্ডা মেয়ে থাকাও ভাল।'

মেয়ে সম্পর্কে বিরক্তি-পরায়ণা হরসুন্দরী আজ এই রায় দিয়ে বসেন।

আর কি শোনবার আছে?

আর কি বলবার আছে?

এখন শুধু দেখতে বেরোনো পৃথিবীটা কত ছোট।

না, মাস পয়লায় হরসুন্দরীর মেয়ের ভায়ী এসে ভাড়াটে হল না তাঁর। ওটা ছল। ঘরটা শূন্য পড়ে রইলো আরও দশ বিশ দিন। এ ঘরের উপযুক্ত খদ্দের আবার জোটা চাইতো?

কিন্তু পয়লা তারিখে হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালীর ওপর একটা মস্ত ধাক্কা এসে লাগলো। ওই সরু বাইলেনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল প্রকাণ্ড একখানা গাড়ী। আর সেই গাড়ী থেকে রাজার মত চেহারার একটা মানুষ নেমে এসে খুঁজেছিল হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালীকে।

আচ্ছা, তাঁর সীমানা কি ওইটুকু পর্যন্তই ছিল? তা'হলে হরসুন্দরী অমন করে কপালে করাঘাত করেছিলেন কেন?

'এই ঘর বাবা! এই দুদিন আগেও ছিল। হঠাৎ কি মতি হল—'

নিজের দুর্মতির কথাটা আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন না হরসুন্দরী। সেটা মনের মধ্যে পরিপাক করে তুষের আগুনে জ্বলতে থাকেন।

কী কুকাজই করেছেন!

আর দুটো দিন যদি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতেন! তা'হলে আজকের নাটকটা কতখানি জমে উঠত, একবার প্রাণভরে দেখে নিতেন।

তা' কি করেই বা জানবেন হরসুন্দরী যে, বলতে মাত্রই পরদিন সকাল বেলাই দম্ভ দেখিয়ে চলে যাবে ছুঁড়ি! দুটো দিনও থাকবে না!

আহা-হা ইস!

এই রাজার মত মানুষটা তাকে খুঁজতে এসে ফিরে যাচ্ছে!

এবারে বোঝাই যাচ্ছে, বাড়ী ছেড়ে চলে আসা নিছক্ রাগের ব্যাপার। যা তেজ, যা রাগ! মানুষটা অতসীর কি রকম আত্মীয় সেটা জানবার দুরন্ত ইচ্ছেকে দমন করে থাকেন হরসুন্দরী। এই হোমরা-চোমরা দীর্ঘদেহ সাহেবী পোষাক পরা লোকটাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। তবু মনে মনে অনুভব করেন, হয় বড় ভাই, নয় ভাসুর। তা' ছাড়া আর কি হতে পারে? ভাসুর হওয়াই সম্ভব, ভাই হলে যতই হোক চেহারায় আদল থাকতো।

'কোনও ঠিকানা রেখে যায়নি?'

'নাঃ!' হরসুন্দরী ক্ষোভ প্রকাশ করেন, 'মানুষকে তো মনিষ্যি জ্ঞান করে না! কেমন যে একবগ্‌গা জেদী মেয়ে!'

এক বগ্‌গা জেদী!

সে কথা মৃগাঙ্কর চাইতে আর বেশী কে জানে!

ঘরটা এমন কিছু বিশাল বিস্তৃত নয় যে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সবটা দেখা যায় না, বলতে গেলে তো এ দেওয়ালে ও দেওয়ালে হাত ঠেকে। তবু মৃগাঙ্ক সহসা চৌকাঠের মধ্যে পা রাখলেন।

দেখতে চেষ্টা করছেন কি, দুদিন আগেও যারা এঘরে ছিল, তাদের উপস্থিতির রেশ এখনো এর মধ্যে সঞ্চরণ করে ফিরছে কিনা? না, তা নয়, মৃগাঙ্ক শুধু অস্ফুট একটা শব্দে শিউরে ওঠাটা দমন করলেন।

এই ঘরে বাস করে গেছে অতসী!

এই দুদিন আগে পর্যন্তও ছিল?

রাত্রে দরজা বন্ধ করলে তারের জাল ঘেরা ঘুলঘুলির মত ওই জানলাটা ছাড়া নিঃশ্বাস

ফেলার দ্বিতীয় আর পথ নেই। আর সেই পথ থেকে উঠে আসছে নীচের কাঁচা নর্দ্দমার দুর্গন্ধবাহী বাতাস।

কিন্তু এত বিচলিত হচ্ছেন কেন মৃগাঙ্ক, সুরেশ রায়ের বাড়ী কি তিনি দেখেন নি?

তবু ব্যাকুল মৃগাঙ্ক ব্যগ্র স্বরে বললেন, 'যদি কোন দিন আসে, যদি আপনার সঙ্গে দেখা হয়, বলবেন, তার যে ছোট্ট বাচ্চা একটা মেয়ে আছে, তার খুব বেশী অসুখ—'

মেয়ে!

কথা শেষ করতে দেন না হরসুন্দরী, চমকে উঠে গালে হাত দেন, 'মেয়ে! বলেন কি বাবা? মেয়ে আছে তার? আপনি যে তাজ্জব করলেন আমাকে! ছেলের থেকে ছোট মেয়ে? সেই মেয়ে ছেড়ে—'

মৃগাঙ্ক বোধ করি এবার সচেতন হন।

মৃদু গম্ভীর স্বরে শুধু বল্লেন, 'হ্যাঁ'। দুর্ভাগ্য শিশু! যাক্ যদি কোন রকম যোগাযোগ—আচ্ছা—একদম একা গেছে? না কোন—'

'না বাবা, কেউ না। একেবারে একা। মায়ে ছেলে দুজনে চলে গেল একটা রিকশা ডেকে। তাই সে রিকশার ভাড়াটাই যে কি করে দেবে ভগবান জানেন! ঘরে তো ভাঁড়ে মা ভবানী। আপনাদের মতন এমন সব আত্মীয় থাকতে—'

মৃগাঙ্ক ততক্ষণে উঠোনে নেমেছেন।

না, মৃগাঙ্কর পক্ষে সম্ভব নয় নিজেকে এর থেকে বেশী ব্যক্ত করা, যতই ব্যাকুল হয়ে উঠুক অন্তর।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

দু'দিন আগে এলেন না মৃগাঙ্ক!

খুকুর টাইফয়েড্! খুকু প্রবল জ্বরের ঘোরে 'মা মা' করছে, এ শুনলেও হয়তো কাঠ হয়ে বসে থাকতো সেই পাষাণ মূর্ত্তি! বলতো, 'খুকুর মা তো অনেকদিন আগে মরে গেছে।'

হয়তো তাই বলতো!

জ্বরে আচ্ছন্ন খুকুকে নার্সের কাছে রেখে এসেছেন মৃগাঙ্ক। আর স্বেচ্ছায় এসে বসে আছে সেই মেয়েটা। যে মেয়েটা সুরেশ রায়ের ভাইঝি।

গতকাল খুকুর একটা 'টাল' গেল। শহরের সেরা সেরা ডাক্তারের ভীড় হয়ে উঠল বাড়ীতে, নার্সের উপর নার্স-এল। আর সহসাই সেই সময় ওই মেয়েটা খুকুর খবর নিতে এল। পথে এ বাড়ীর কোন ঝি চাকরের সঙ্গে দেখা হয়েছে, শুনেছে খুকুর অসুখ।

ভাবলে অবাক লাগে, সেই কাল থেকে মেয়েটা মৃগাঙ্কর বাড়ীতেই রয়ে গেল। নার্সের সঙ্গে মিলে মিশে দেখাশোনা করতে লাগল খুকুকে।

মৃগাঙ্ক অস্বস্তি বোধ করে বারবার অনুরোধ করেছেন বাড়ী ফিরে যেতে, তার যে একটা

ছোট ছেলে আছে—সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু শ্যামলী গ্রাহ্য করে নি ব্যাপারটা। বলেছে ছেলে তার যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে।

মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে দেখলেন মেয়েটা কত সহজে সহজ হয়ে গেল। পরের বাড়ী থেকে গেল। সময় মত চান করে খেয়ে নিল, 'কাকাবাবু আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে—' বলে জোর করে পাশের ঘরে ঘুমোতে পাঠিয়ে দিল মৃগাঙ্ককে। কোথাও ঠেক্ খেল না। সরল—মানে বোকা! আর বোকা বলেই হয়তো বা নিজের জীবনকে কোনদিন জটিল করে তুলবে না।

হয়তো মৃগাঙ্কর ভাবনাই ঠিক।

অতসী আর অতসীর ছেলের বুদ্ধি প্রখর, তাই ওরা জীবনকে ক্রমশঃ জটিল করে তুলছে।

নইলে খেটে খাওয়া ছাড়া যার জীবনে আর কোনও গতি রইল না, সে তুচ্ছ একটু অভিমানের বশে সুরেশ্বরীর কাজটা ছেড়ে দেয়।

সে তো তবুও মোটা মাইনের সম্ভ্রম ছিল।

এখন যে 'খাওয়া পরা রাঁধুনীর' কাজ।

হ্যাঁ তাই মেনে নিতে হয়েছে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে আহার আর আশ্রয় জোগাড় করবার এছাড়া আর উপায় কি?

এই যে জোগাড় হয়েছে সেটাই আশ্চর্য্য। এমন হয় না। রিকশা করে অনেকটা দূর এগিয়ে অতসী হঠাৎ একটা গেটওয়ালা বড় বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলেকে বলেছিল, 'দাঁড়া তুই এই জিনিস পত্র আগলে, আমি আসছি।'

আর খানিকক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে ছেলেকে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল 'আয়।'

'এখানে কি!' সীতু আড়ষ্ট হয়ে বলে উঠেছিল 'এরা তোমার চেনা?'

'না! চেনা করে নিতে হবে। করে নিলাম।'

অতসীর অনেক ভাগ্য যে, ঠিক যে সময় বাড়ীর গিন্নী রাঁধুনীহীন অবস্থায় 'কারে' পড়ে রয়েছেন, সেই সময় অতসী গিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিল, 'রান্নার লোক রাখবেন?'

রান্নার লোক!

গিন্নী ভাবলেন, তাঁর আকুল প্রার্থনায় স্বয়ং ভগবান কি ছদ্মবেশিনী কোন দেবীকে পাঠিয়ে দিলেন। বিহ্বলতা কাটতে কিছুক্ষণ গেল। তারপর থতমত সুরেই বললেন, 'রাখবো তো, লোকের তো দরকার। কিন্তু তুমি কে কি বৃত্তান্ত না জেনে—'

অতসী মনকে দৃঢ় করে এনেছে, এনেছে স্নায়ুকে সবল করে। তাই স্পষ্ট গলায় বলে, 'আমাকে দেখে কি আপনার চোর ডাকাত অথবা খুব খারাপ কিছু মনে হচ্ছে?'

'না না খারাপ কেন? সরস্বতী প্রতিমা খানির মত তো চেহারা! তা বলছি না। মানে—'

'মানে ভাববার কিছু নেই। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমার জন্যে কোন বিপদে পড়তে হবে না আপনাকে।'

'তা' তুমি হঠাৎ এমন ভাবে কোথা থেকে—'

'বুঝতেই পারছেন, খুব একটা অসুবিধেয় না পড়লে এভাবে মানুষ আসে না। সেইটা মনে করে আমার সম্পর্কে বিচার করবেন।'

আঘাত খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে অতসী, শিখেছে কথা বলতে।

'তা' বেশ, থাকো তবে। আজ থেকেই থাকো। রান্নাটান্না জানো তো?'

অতসী মৃদু হেসে বলে, 'চালিয়ে নেব।'

'হুঁ, মনে হচ্ছে জানো। তা' মাইনে টাইনে—'

এবার অতসী আরও বুক শক্ত করে ফেলছে। তাই অবলীলার ভানে বলে, 'মাইনে লাগবে না, তার বদলে আমার ছেলের ভার নিতে হবে।'

'ছেলে!'

গিন্নীর মুখটা পাংশু হয়ে যায়। 'ছেলে আছে?'

অতসী শান্ত দৃঢ় স্বরে বলে 'হ্যাঁ। ছেলে না থাকলে শুধু নিজের জন্যে কে অপরের দরজায় দাঁড়াতে আসে বলুন? পৃথিবীতে মৃত্যুর উপায়ের অভাব নেই।'

গিন্নী আরও থতমত খেয়ে বলেন, 'কিছু মনে কোর না বাছা, মানে কর্তাকে না জিজ্ঞেস করে ছেলের বিষয়—'

'তিনি বাড়ী নেই?'

'আছেন। ওপরে আছেন। বেশ তুমি বোসো, জিজ্ঞেস করে আসি। কত বড় ছেলে?'

'ক্লাস সিক্সে পড়ে।'

'ওমা তাহলে তো বড় ছেলে।'

গিন্নী অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন, 'দেখে তো তোমায় খুব ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে, এ অবস্থা কত দিন হয়েছে?'

অতসী মাথা নীচু করে বলে, 'ওকথা জিজ্ঞেস করবেন না।'

ভদ্রমহিলা আসলে ভদ্র-প্রকৃতি।

এবং অতসীর মধ্যে তিনি সাধারণ রাঁধুনীর ছাপ দেখতে পান নি বলেই আকর্ষিত হলেন। ভাবলেন, ঠাকুর মুখপোড়া যদি দেশ থেকে আসে তো একে ঘরের কাজের জন্যে রাখবো। বাড়ীর মেয়ের মত থাকবে। ছেলেটা? তা ওর মাইনের বদলে তো ছেলেটার ইস্কুলের মাইনে আর খাওয়া দাওয়া একটু বেশী পড়বে বটে। থাক্, ভদ্রঘরের মেয়ে বিপাকে পড়েছে।

মিনিট দুই তিন পরেই নেমে এলেন তিনি, বললেন, 'কর্তার অমত নেই। তা'হলে ছেলেকে নিয়ে এস। কখন আসবে?'

'এখনই।' বলে বেরিয়ে গেল অতসী।

কর্ত্তা গিন্নীর বয়েস হয়েছে। মেয়ে নেই, আছে দুটি বিবাহিত ছেলে। দুইটিই বিদেশে কাজ করে, স্ত্রী পুত্র নিয়ে বছরে একবার ছুটিতে আসে। বাকী সময় কর্ত্তা গিন্নী এত বড় বাড়ীটায় একাই থাকেন। চাকর বাকর নিয়েই সংসার।

অবস্থা ভাল, তাই সাধারণ নিয়মে গিন্নীর হার্টের অসুখ, বাতের কষ্ট। রান্নার লোক বিহনে দুদিনেই হাঁফিয়ে ওঠেন।

অতসীকে দেখে তাঁর মনটা আশায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। বৌরা চলে গিয়ে পর্যন্ত এমনি ঘরের মেয়ের মত একটি ভদ্র মেয়ে তাঁর কল্পনার জগতে ছিল।

কর্তাও এক কথায় রাজী হয়ে যান। বলেন 'নাতিপুতি কেউই তো থাকে না, একটা ছেলে থাকুক পড়ালেখা করুক, ভালই।'

আশ্রয় জুটলো।

নিরাপদ আশ্রয়। ভাল ঘর, সৎ পরিবেশ! আর তবে কিছু চাইবার নেই অতসীর?

গভীর রাত্রে যখন সীতু ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় অতসী। হ্যাঁ, দোতলাতেই ঠাঁই পেয়েছে সে। গিন্নী বলেছেন, নীচে চাকর বাকরের আড্ডা। ওখানে আমি তোমাকে থাকতে দিতে পারবো না বাছা, ওপরেই আমাদের ঘরের কাছাকাছি থাকো। সকল ঘর দোরই তো খালি পড়ে।

বারান্দার কোণের দিকের ছোট একটা ঘরে মা ছেলে আশ্রয় পেল।

রাত্রে যখন ঘুম আসে না বারান্দায় এসে দাঁড়ায় অতসী। নিজেকে যেন আর সেই হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালীর ভাড়াটের মত দীন হীন মনে হয় না, আর সেই সময় ভাবতে থাকে অতসী। তাহলে আর কিছু চাইবার রইল না তার? এই পরম পাওয়ার ভেলায় চড়ে সমুদ্র পার হবার সাধনা করে চলবে? পৃথিবীর আরো অসংখ্য দুঃখী মেয়ের মত দাসীবৃত্তি করে ছেলেকে কোন রকমে বড় করে তুলবে, তারপর ছেলের উপার্জ্জনের ভাত খেয়ে মনে করবে জীবনের চরম সার্থকতার সন্ধান মিললো তবে? মিললো দীর্ঘ সংগ্রামের পুরস্কার?

জীবনে মৃগাঙ্ক বলে কোনদিন কোন এক দেবতার দর্শন মিলেছিল সে কথা নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলতে হবে সমস্ত চেতনা থেকে? আর তুলোর পুতুলের মত সেই একটা জীব সে কোন দিন পৃথিবীতে এসেছিল, একেবারে ভুলে যেতে হবে সে কথা?

আশ্চর্য্য! তবু বেঁচে থাকবে অতসী। বেঁচে আছে। সহজ সাধারণ মানুষের মত খাচ্ছে ঘুমুচ্ছে, নিশ্বাস নিচ্ছে, কথা বলছে, এমন কি হাসছেও।

সেই তুলোর পুতুলটার কোন বার্ত্তা আর কোনদিন জানতে পারবে না।

সে বার্ত্তা নিয়ে যে অতসীর দরজায় দাঁড়াতে এসেছিল একজন, জানতেও পারল না অতসী।

হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালী অতসীদের 'খবর খবর' করে হাঁফিয়ে মরলেন, অথচ এ বুদ্ধিটুকু

মগজে আনতে পারলেন না, সীতুর স্কুলে একবার খোঁজ করে দেখলে হতো! অতসীর যে একটা মেয়ে আছে, তার বাড়াবাড়ি অসুখ শুনলে কী করতো অতসী সেটা আর দেখা হ'ল না হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালীর।

'বেইমান! মহা বেইমান!'

ভাবলেন হরসুন্দরী। নইলে এত উপকার করলেন তিনি, সে সব ভস্মে গেল। এতটুকু কি একটু বললেন, বড় হয়ে উঠল সেটাই? একবার কি দেখা করতে আসতে পারত না?

অতসীও স্তব্ধ রাত্রে জনশূন্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, সীতু অকৃতজ্ঞ, সীতুর মা-ই বা অকৃতজ্ঞতায় কী কম যায়! নইলে শ্যামলীর কাছ থেকেও নিজেকে লুপ্ত করে নিল কি করে? শ্যামলী হরসুন্দরীর বাড়ী জানতো, এ বাড়ীর সন্ধান পাবার কোন উপায় তার নেই।

কিন্তু চিঠি লিখে ঠিকানা জানাবে অতসী কোন পরিচয় বহন করে?

শিবনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ীর রাঁধুনী?

কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি।

আকাশে নক্ষত্রের সভা অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে কেমন একটা ভয় ভয় আর মন ঝিম ঝিম করা অনুভূতি আসে। তেমনি অনুভূতিতে অনেকক্ষণ নিথর হয়ে থেকে অতসী ভাবে, এমন করে হারিয়ে গিয়ে, আবার কোনদিন কি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে?

ছেলেকে তো দৃঢ়চিত্তে শাসন করেছিল সে সেদিন, 'মরে যাবো কেন? মরে গেলেই তো হেরে যাওয়া হ'ল। তোমাকে মানুষ হতে হবে, মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর উপযুক্ত হতে হবে।'

কিন্তু কবে সেই উপযুক্ততা আসবে সীতুর? আর যখন আসবে, তখন কি তারা অবিকল থাকবে? যাদের সামনে উঁচু মাথা নিয়ে গিয়ে দাঁড়ানোর মূল্য?

যদি তা না হয়, যদি এই হারিয়ে যাওয়া দিন থেকে কূলে উঠে দেখে অতসী, যাদের দেখাবার জন্যে এই কাঁটাবনের সংগ্রাম, তারাই গেছে হারিয়ে? আর সেই পুতুলটা—

অসম্ভব একটা যন্ত্রণায় মাথাটা ঠুকতে ইচ্ছে করে অতসীর। ইচ্ছে করে 'খুক্ খুক্' করে চীৎকার করে কাঁদে।

কিছুই করতে পারে না।

শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে উর্দ্ধলোকের নক্ষত্র সভায়।

মৃগাঙ্ক কি কোন দিন রাত্রে জেগে থাকেন? তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে?

কিন্তু যদিই থাকেন?

সে খবর জানবার দরকার কি—শিবনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ীর রাঁধুনীর?

বর্ষা যায় শরৎ আসে, গাঙ্গুলীদের 'মেয়ের মতন' রাঁধুনীর দিন কাটে মৃদুমন্থরে। ভারাক্রান্ত, ক্লান্ত ছন্দ, 'রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার' একটানা একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি।

কাজের চাপ বেশী থাকলেও বুঝি ছিল ভাল, তাতে তাল উঠত দ্রুত। কিন্তু এঁদের সংসার ছোট, চাহিদা কম, পুরনো চাকর আছে, সে প্রায় সবই করে, অতসীর অনেক অবসর।

কিন্তু সে অবসরকে কাজে লাগাবার সুবিধে কোথায়? অতসী ভাবে, আমি কি আবার লেখাপড়া করবো? আমি কি চেষ্টা করে কোথাও সেলাই শিখবো? আমি কি আমার আয়ত্তাধীন বিদ্যে পশম বোনাটাকে কাজে লাগিয়ে উপার্জ্জনের চেষ্টা করবো? একটা কিছু না করে কি করে কাটাবো আমি? আর কতদিন বহন করবো এই রাঁধুনীর পরিচয়?

ভাবে, ভেবে ভেবে উত্তাল হয়ে ওঠে তার দিনের অবসর, বিনিদ্র রাত্রি মর্মরিত হয়ে ওঠে সে ভাবনার দীর্ঘশ্বাসে। কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারে না। ভয়ঙ্কর এক ভয় গ্রাস করে থাকে তাকে, পথে পা বাড়াতে দেয় না।

এ তো হরসুন্দরীর পাড়ার সর্পিল গলি নয়, এটা বড় রাস্তা। আর জীবনের সম্ভ্রম খুঁজে নিতে পা বাড়াতে হ'লে তো বড় রাস্তার পথ ধরেই চলতে হবে।

কিন্তু বড় রাস্তায় পা ফেলতে যে সেই দুর্দ্দমনীয় ভয়। যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

দেখা হয়ে গেলে কী হয়!

অনেক দিন ভেবেছে অতসী, আর ভাবতে ভাবতে খেই হারিয়ে ফেলেছে। কী হয়, সেটা আর সম্পূর্ণ একটা ছবিতে পরিণত করতে পারে নি।

খেই হারাতে হারাতে ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে তার অতীত জীবন। শ্লেট পাথরের মত একটা বিবর্ণ ভারী ভারী অনুভূতি ছাড়া সবই যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ভুলে যাচ্ছে এ বাড়ীর রাঁধুনী ছাড়া আর কোন পরিচয় অতসীর ছিল।

তা এমন অতীত হারানো বিস্মৃতির কুয়াসা অনেক মেয়ের জীবনেই তো ক্রমশঃ পাকা বনেদ নিয়ে বসে। বিদেশে বাসায় রান্নার হালে কাটাতে কাটাতে হঠাৎ ওঠে কাল বৈশাখীর ঝড়, তছনছ করে উড়িয়ে নিয়ে যায় পাখীর বাসাটুকু, ভাগ্যহতের পরিচয় সর্ব্বাঙ্গে বহন করে এসে আশ্রয় নিতে হয় তাদের কাছে, যারা এ যাবৎ তার সুখসৌভাগ্যে আনন্দের থেকে ঈর্ষা অনুভব করেছে বেশী। সেখানে গৃহকর্মের সমস্ত দায় মাথায় নিয়ে সেই মেয়েকে টিঁকে থাকতে হয় সংসার নামক বৃক্ষের শাখায়। যদি তাকে টিঁকে থাকাই বলা হয়।

তখন, সেই দাস্যবৃত্তির অন্তরালে কোন দিন কি কখনো মনে পড়ে তার একদা অনেক সুখ তার হাতের মুঠোয় ছিল?

ভুলে যায়!

অতসীও ক্রমশঃ ভুলছে। ভুলছে বললে ঠিক বলা হয় না, মনে আনার চেষ্টাই করছে না। কেন করবে, অতসীকে তো তার ভাগ্য প্রত্যক্ষ আঘাত হানে নি। আপাতদৃষ্টিতে তো দেখলে মনে হয় অতসী নিজেই হাতের মুঠো আলগা করে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে তার সুখ, তার জীবন।

তাই অতসীর অনেক ভয়।

ভয়, যদি পথে বেরিয়ে হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে যেতে হয় সেই অনেক দিনের সুখের অতীত জীবনের সঙ্গে।

কিন্তু অতসী কি বুঝতে পারে সীতুও আজকাল ওই এক রোগে ভুগছে। ওই ভয় রোগে। 'যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!' এই আতঙ্কে সীতু স্কুলে যায় আসে প্রায় চোখ বুজে।

না, অতসী জানে না।

সে দিনের সে কথা সীতু অতসীকে বলে নি। তা কবে আর কোন কথা মার কাছে বলে সীতু? তাই সেদিন বলবে পথে কী ভয়ানক ঘটনা ঘটেছিল? সেদিন সীতু শুধু আরক্ত মুখ আর ভয়ঙ্কর ওঠা পড়া বুক নিয়ে ছুটে এসেছিল। আর অতসীর ব্যাকুল প্রশ্নে বলেছিল, 'রাস্তায় পড়ে গেছি।'

অতসী কি করে জানবে সেদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে মোড় পার হবার মুহূর্তে সীতুর পাশ দিয়ে ধাঁ করে বেরিয়ে গিয়েছিল একখানা ভয়ঙ্কর পরিচিত মোটরগাড়ী। আর তার চালকের আসনে যে বসেছিল সে সীতুর দিকে চোখ ফেলে নি বলেই এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছিল সীতু।

হ্যাঁ, সে লোকটার এদিক ওদিক কোনদিকেই যেন দৃষ্টি ছিল না।

গাড়ীটা চোখের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত [illegible] বিশ্বাস হয় নি সীতুর, যা দেখল সত্যি কি না, অথচ ভেবে দেখলে সত্যি হওয়াটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

আশ্চর্য্য নয়, তবু বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল মিনিটের পর মিনিট।

ও যে কোথায় ছিল, কোথায় যাচ্ছিল, সবই যেন বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল সেই অদ্ভুত মুহূর্তগুলিতে।

চেতনার জগতে ফিরে এল ঘাড়ের ওপর একখানা ভারী হাতের থাবার চাপে আর একটা দুর্বোধ্য চীৎকারে—

চমকে পিছন ফিরে কাঠ হয়ে গেল সীতু।

হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালী!

তীব্রস্বরে চেঁচাচ্ছেন, 'ও সর্বনেশে ছেলে, এখনো তোরা এ তল্লাটেই আছিস? আর আমি—'

'আঃ লাগছে ছেড়ে দিন—'

সীতু কাঁধটায় ঝাঁকুনি দিয়ে সেই ভারী থাবার কবলমুক্ত হতে চেষ্টা করে। কিন্তু থাবাটি বড় শক্ত ঘাঁটি। তাছাড়া হরসুন্দরী তখন রাগে দুঃখে আবেগে উত্তেজনায় মরীয়া। তিনি বরং আরও শক্ত করে চেপে ধরে বলেন, 'এইখানেই আছিস! এখনো এই ইস্কুলেই পড়িস! ও মা, আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে গো! অতবড় একটা মান্যিমান লোক রোজ আসছে আমার দরজায় তোদের তল্লাস নিতে, রোজ আমি লজ্জায় অধোমুখ হয়ে যাচ্ছি, দিতে পারছি না একটা খবর। বলি কী ব্যাপার তোদের? অতবড়

গাড়ী চড়ে অমন মানুষটা হ্যাং হ্যাং করতে করতে আসে তোদের মা বেটার খবর নিতে, আর তোরা ঘাপটি মেরে বসে আছিস এখানেই? হা আমার কপাল! বলি তোর মা'র এত তেজ কেন বলতো?'

'চুপ করুন। আপনাকে মার কথা বলতে হবে না।'

'না তা তো হবেই না। যেমন তুমি আর তেমনি তোমার মা! এদের জন্যে আবার মানুষ খবর খবর করে খুঁজে বেড়ায়! আমি হলে তো—'

সীতু হঠাৎ কেমন একটু শিথিল ভাবে বলে 'কে খুঁজতে আসে?'

'কে তা তোমরাই জানো। তোমার মামা-দাদা কি জ্যাঠা-খুড়ো। হোমরাচোমরা চেহারা, তাই দেখি। এই নিত্যদিন আসছে 'খবর আছে কি না।'

আমিও আজ শুনিয়ে দিয়েছি, 'তারা খবর দেবার লোক নয় মশাই, বেইমানের ঝাড়। মিথ্যে আপনি আশা করছেন। যে মেয়ে মানুষ কোলের কচি মেয়ে ফেলে তেজ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে—'

'ছেড়ে দিন।'

কাঁধ ছাড়িয়ে পথে নামে সীতু।

আর হরসুন্দরী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অনেক বিষাক্ত রস মিশিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'এই শোন্ ছোঁড়া, শুনে যা। সেই আহাম্মুক লোকটা বলে গেছে যদি তোদের সঙ্গে দেখা হয় তো—যেন জানাই, তোর মার কোলের সেই কচিটার মরণবাঁচন অসুখ। বুঝলি? যায় যায় অবস্থা। বাড়ীতে দিন দশটা করে ডাক্তার আসছে।'

প্রতিহিংসা চরিতার্থের বিষাক্ত আনন্দে হাঁফাতে থাকেন হরসুন্দরী। আর সীতু? সে যেন হঠাৎ স্থানু হয়ে যায়। ভুলে যায় সে পুতুল নয়। কিছু না হোক নিশ্বাস ফেলাও তার একটা ডিউটি।

যখন চেতনা ফেরে, দেখে অনেক দূরে হরসুন্দরীর পিঠের চাদরটা শুধু দেখা যাচ্ছে।

সীতু কি ছুটে যাবে?

ছুটে গিয়ে চীৎকার করে বলবে, 'কী অসুখ হয়েছে সেই খুকুটার? বল শীগগির!'

না সীতু ছুটে যেতে পারে না।

বলতে পারে না।

শুধু তার সমস্ত প্রাণ আছাড়িপিছাড়ি খেতে থাকে সেই প্রশ্নটার ওপর।

'কী অসুখ হয়েছে সেই খুকুটার? বল শীগগির।'

তবু অতখানি যন্ত্রণার ভার নিজের মধ্যে সংহত রেখেছিল সে। বাড়ী এসে বলেছিল রাস্তায় পড়ে গেছি।

কিন্তু মাকে যা হোক বলে বোঝানো যত সহজ, নিজেকে বোঝানো কি তত সহজ? প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত যে ছুঁচের মত ফুটিয়ে ফুটিয়ে একটা কথা উচ্চারণ করছে, 'সেটার মরণবাঁচন অসুখ!'

তুলোর পুতুলের মত গোলগাল খ্যাদা খ্যাদা সেই ছোট্ট মানুষটারও ওই রকম ভয়ানক বিচ্ছিরি অসুখ করতে পারে? হরসুন্দরী যাকে বলেন 'মরণ বাঁচন'।

আর যদি শেষের কথাটা আর না থাকে?

শুধু প্রথম কথাটাই—

শিউরে কেঁপে ওঠে সীতু, আর ভাবতে পারে না। সেই বিশেষ একটি রাস্তার উপরকার বিশেষ একখানি বাড়ী তীব্র একটা আকর্ষণে অহরহ টানতে থাকে চির-নির্মম চির-উদাসীন একটা বালক চিত্তকে। অথচ পথে বেরোতে তার ভয় করে পাছে দেখা হয়ে যায় কারো সঙ্গে। এ এক আশ্চর্য্য রহস্য!

সীতু কি স্বপ্নে এমন কোন মন্তর পেয়ে যেতে পারে না যাতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়, আর উড়ে চলে যেতে পারা যায়—যেখানে ইচ্ছে?

রোজ রাত্রে ঘুমের আগে কাতর প্রার্থনা করে সীতু। যে ভগবানকে মানে না সেই ভগবানের কাছে। প্রার্থনা করে যেন সেই অলৌকিক স্বপ্ন দেখে, যাতে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসে মৃদু হেসে বলছেন, 'বর চাস? কী বর?'

হায়, প্রতিটি সকাল আসে ব্যর্থতা বহন করে। সীতুর জ্ঞানের জগতে যত কটূক্তি আছে, সমস্ত বর্ষণ করে সে অক্ষম ভগবানের উপর। অথচ আবার ঘুরে ফিরে সেই অলৌকিকের কথাই ভাবতে থাকে।

ধর, পথ চলতে চলতে পায়ের কাছে কুড়িয়ে পেল সীতু একটা শিকড়, সেটা কুড়িয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে. আর উড়তে আরম্ভ করল।

তারপর?

তারপর—

সেই একখানি ঘরের একটি বিশেষ জানলার বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে এক অদৃশ্যদেহী বালক, বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে।

ঘরের মধ্যে 'দশটা ডাক্তার' ঘুরে বেড়ায়, ফিসফিসিয়ে কী যেন বলাবলি করে, বুকের মধ্যেটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে ওই ছেলেটার।

ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখে সেই পুতুলটা কোথায়?

ছোট্ট খাটের মধ্যে লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে প্রবল জ্বরে ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছে? না কি নিশ্বাস আর কোন দিন ফেলবে না সে?

হঠাৎ কেঁদে ওঠা ঘুমন্ত ছেলেকে 'ঘাট ঘাট' করে ভোলায় অতসী, বলে 'জল খাবি সীতু? গরম হচ্ছে সীতু? খারাপ স্বপ্ন দেখেছিস সীতু?'

সীতু আর সাড়া দেয় না।

শুধু মায়ের হাতটা আঁকড়ে ধরে।

অতসী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। অস্বাভাবিক সীতুর মধ্যে কি তা'হলে তীব্র কোন মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে?

সকালবেলা মনিব গিন্নী প্রশ্ন করেন, 'রাত্তিরে ছেলে কেন কেঁদে উঠেছিল সীতুর মা?'

অতসী ম্লান ভাবে বলে 'স্বপ্ন দেখে মা!'

হ্যাঁ, আর মাসীমা নয়, মা।

শ্রদ্ধার ডাক, ভালবাসার ডাক, আবার প্রভুভৃত্যের চরম মামুলি ডাক। তবু 'মা' বলতেই হয়। মনিব গিন্নীর তাই বাসনা।

'মাসীমা' কেন গো? মা বলবে। আমার মেয়ে নেই।' বলেছিলেন তিনি।

মেয়ে নেই তাই তো 'মেয়ের মতন'।

তাই তো অতসীরও এ এক পরম বন্ধন।

'স্বপ্ন দেখে?' মনিবগিন্নী বলেন, 'পেট গরম হয়েছে। একটু মৌরী মিশ্রির জল করে খাইয়ে দিও দিকি, ঠাণ্ডা হবে।'

সরল মানুষ এর চাইতে বেশী কিছু জানেন না, বোঝেনও না। সত্যিই ভারী সরল।

আজ সকালে কিন্তু তাঁর কথাতেও একটু অসারল্যের ছোঁয়াচ লাগলো। অতসীকে ডেকে বললেন, 'শুনেছ অতসী, আমার ব্যাটা, ব্যাটার বৌ যে দয়া করে গরীবের কুঁড়েয় পদার্পণ করতে আসছেন।'

অতসী ঈষৎ বিস্মিত হয়।

আনন্দের বদলে এমন সুর কেন?

তবে সে সহজ ভাবেই বলে, 'পুজোর ছুটি হয়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই লিখেছিলেন বাবু! পুজোর আগেই বেরোচ্ছি, দিন পনের ছুটি বাড়িয়ে নিয়েছি।' তা তোমায় মিথ্যে বলব না অতসী, বৌ আমার মন্দ নয়, মতি বুদ্ধি ভালই ছিল। কিন্তু কথায় আছে, সঙ্গদোষে শত গুণ নাশে। তোমার কাছে তো সব কথাই বলি—আমার ওই ছেলেটিই যেন বিলেতের সাহেব! যত ফ্যাসান, তত ফি কথায় নাক বাঁকানি! ওর সঙ্গে পড়ে বৌও—'

অতসী শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায়।

কি জানি আবার কোন ঝড় ওঠে! কে জানে এই স্তিমিত নিস্তরঙ্গতার উপর সে ঝড় কোন তরঙ্গ তুলবে! যে ছেলে 'বিলেতের সাহেবটি', সে কি বরদাস্ত করবে রাঁধুনী আর রাঁধুনীর ছেলের উপর তার মায়ের এই স্নেহাতিশয্য?

আর সেই বৌ?

সঙ্গদোষে যার শত গুণ নাশ হয়েছে। বৌ জাতীয়াকে বড় ভয় অতসীর। যদি সুরেশ্বরীর ছেলের বৌয়ের মত হয়?

'কবে আসবেন?'

'কবে কি গো, আজই।' মনিব গিন্নী স্বভাবছাড়া একটু ব্যঙ্গ হাসি হাসেন, 'ট্রাঙ্ককলের টেলিফোন জানো? তাই করে খবর দিল যে এক্ষুনি। আমার ছেলের কোন কিছুতেই দিশিয়ানী নেই। দু'দিন আগে খবর দেবে না। পথে বেরিয়ে কোন ইষ্টিশন থেকে টেলিফোন করবে। বললে বলে, নিজের বাড়ীতে আসবো তার আবার খবর কি! কিন্তু শুনতেই ওই 'নিজের বাড়ী'। এক মাসের ছুটি তো কুড়ি দিন শ্বশুরবাড়ীতেই কাটাবে।

ছেলে বৌয়ের সম্পর্কে অনেকগুলি তথ্য পরিবেশন করে ফেলেন ভদ্রমহিলা।

অতসী আর কি করবে?

সমস্ত রকম অবস্থার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখা ছাড়া? ওঁর বৌ ছেলে যদি রাঁধুনী আর রাঁধুনীর ছেলেকে নিজেদের পাশাপাশি সহ্য করতে না পারে, যদি নীচে নামিয়ে দেয়, তাও মেনে নিতে হবে বৈকি।

নীচের তলায় নামাটা তো কিছুই নয়, অন্য সব চাকরবাকরদের চোখে অনেক নেমে যাওয়া এই যা! তবু তাই যেতে হবে। সেইটাই তো প্রস্তুতির সাধনা।

শুধু সীতু?

বিরাট একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন!

কিন্তু অতসীর আশঙ্কা অমূলক।

ওরা ও রকম নয়।

অতসী দোতলায় কেন আছে, বা একতলায় কেন থাকবে না, এ নিয়ে মাথা-ঘামাল না ওরা।

ট্রেন থেকে নেমেই স্নান সেরে বাপের বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হতে বৌ বলল, 'মা, আপনার ঘরের পাশে ওই ছোট ঘরটায় কাকে যেন দেখলাম? কেউ এসেছেন না কি?'

'মা' বলে ওঠেন, 'ওটি আমার কুড়নো মেয়ে বৌমা! ঈশ্বর প্রেরিত। ঠাকুর দেশে চলে যাওয়ায় যখন অসুবিধেয় মরছি, তখন হঠাৎ একদিন—'

বৌ কথায় যবনিকাপাত করে বলে, 'ওঃ রান্নার লোক? তা দেখতে তো বেশ পরিচ্ছন্ন, নেহাৎ 'লো' ক্লাশ বলে মনে হ'ল না।'

অতসী পাশের ঘর দিয়ে যাচ্ছিল।

দেয়ালটা ধরল।

শুনতে পেল না তারপর আর কি কথা হ'ল। সচেতন হ'ল তখন, যখন বৌ ব্যস্তভাবে এদিকে যেতে যেতে অতসীকে দেখে বলে উঠল 'আচ্ছা ওই ছেলেটি তোমার তো?'

অতসী মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

বৌ দালানে টাঙানো আর্শীটার সামনে তাকিয়ে বেশবাসে দ্রুত আর একটি 'সমাপ্তি স্পর্শ' দিতে দিতে বলল, 'ওকে আমার সঙ্গে আমার বাপের বাড়ীতে নিয়ে যাবো?'

'আপনার বাপের বাড়ীতে!' অতসী অবাক হয়। অতসী কারণ নির্ণয় করতে পারে না। অতসী দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলে, 'ছেলেটা বড্ড লাজুক, যেতে চাইবে কি?'

'চাইবে না?'

সভ্য তরুণী আর জোর করে না, বলে 'তবে থাক। গেলে একটু সুবিধে হতো। ওখান থেকে বেবিকে ধরার লোকটিকে আনতে পারি নি, বেচারার অসুখ করেছে। এই ঠিক তোমার ছেলের মতই ছেলে। তাই ভাবছিলাম ওকে পেলে হয়তো—যাকগে আমার বাপের বাড়ীতে তো লোকজনের অভাব নেই। তবে যেত, ভাল ভাল খেত, খেলত—'

হঠাৎ অতসী দৃঢ়স্বরে বলে, 'আচ্ছা দাঁড়ান, আমি বলছি।'

ঘরে গিয়ে তেমনি দৃঢ় স্বরেই বলে, 'সীতু, ওই যিনি এসেছেন, ওর সঙ্গে ওর বাপের বাড়ী যেতে হবে তোমায়।'

সীতু এ আদেশের মর্ম ঠিক ধরতে পারে না, থতমত খেয়ে বলে, 'কেন, আমি লোকেদের বাপের বাড়ী যেতে যাব কেন?'

অতসী আরও দৃঢ়স্বরে বলে, 'কেন যাবে শুনবে? ওর সঙ্গে ওর ওই বাচ্চাটিকে কোলে করে বেড়াতে।'

'ইস!' সীতু তীব্রকণ্ঠে কলে, 'টিকটিকির মত ওই মেয়েটাকে আমি কোলে নেব বৈকি। ছুঁতেই ঘেন্না করে।'

'চুপ। এসব কথা মুখে আনবে না। যাও ওই আলনা থেকে জামা পেড়ে পরে চলে যাও ওঁর সঙ্গে, সেখানে খেতে পাবে। খুব ভালো ভালো। বুঝলে। যাও ওঠ।'

মায়ের এই নিষ্ঠুরতায় কঠিন কঠোর সীতুর বুঝি চোখে জল এসে যায়। লাল লাল মুখে বলে, 'না যাব না। আমি কি চাকর?'

অতসী হঠাৎ ফেটে পড়ে।

চাপা গর্জনে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ তাই। বুঝতে পার নি এতদিন? টের পাওনি চাকর হওয়াই তোমার বিধিলিপি। আমি হুকুম করছি চাকরই হওগে। যাও ওঁর সঙ্গে, 'সারাদিন ওঁর মেয়ে কোলে নিয়ে বেড়াওগে। ওরা যদি উঠোনের ধারে খেতে বসতে দেয় মাথা হেঁট করে তাই খাবে, একটি কথা বলবে না। যাও—যাও বলছি। অপেক্ষা করছেন উনি। কী, তবু বসে রইলে? পেড়ে আনো জামা—'

মাটিতে বসে পড়ে অতসী। হাঁফাতে থাকে।

আর সীতুর চোখের সামনে বুঝি সমস্ত পৃথিবী ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। মার ওই বসে পড়া

চেহারাটার দিকে তাকাতে সাহস হয় না। উদভ্রান্তের মত আলনা থেকে শার্টটা পেড়ে গায়ে গলাতে গলাতে নীচে নেমে যায়।

গিয়ে দাঁড়ায় বাইরে গাড়ীর কাছে। যে গাড়ী বৌকে নিতে এসেছে তার পিতৃগৃহ থেকে।

বৌ বোধকরি হাতে চাঁদ পায়, হৃষ্টচিত্তে বলে, 'ও তুমি যাচ্ছ? এস, গাড়ীতে উঠে এস।'

সত্যিই গাড়ীতে উঠে বসে সীতু।

কিন্তু সে কি সত্যিই সীতু?

নাকি কোন যন্ত্রচালিত পুতুল?

বৌ ওর কোলে নাইলনের ফ্রক পরা সেই 'টিকটিকি' বিশেষণ প্রাপ্ত শিশুটিকে গুছিয়ে বসিয়ে দিয়ে বলে 'নাও বেশ ভাল করে ধরো। ফেলে দিও না যেন।'

না সীতু ফেলে দেবে না।

কিন্তু সেই 'কাঠির মুঠি' মেয়েটাই প্রবল আপত্তি তুলে সীতুকে তচনচ করে দেয়। অচেনা কোল বলে? না কি শিশু বোঝে অনাগ্রহের অনুত্তাপ?

'এই দেখ, তুমি যে সামলাতেই পারছ না? বৌ রেগে ওঠেনা, হেসে ওঠে। সহজ ভাবে বলে 'ভাল করে ধরতে পারছ না কিনা, তাই মহারাণীর মেজাজ গরম হয়ে উঠেছে। তোমার তো কোন ছোট ভাই বোন নেই, তাই অভ্যাস নেই। দাও আমায়, কী···রে··· দুষ্টু, বাহন পছন্দ হল না?'

মেয়েকে কোলে করে ভোলাতে ভোলাতে শান্ত করে বলে সে, 'চিনে যাবে। দু'দিনেই চিনে যাবে। দেখো তখন তোমাকে ছাড়তেই চাইবে না। তুমি যে আবার স্কুলে পড শুনলাম। তাছাড়া তোমর মার তুমি এক ছেলে, মা নিশ্চয় ছাড়তে রাজী হবে না। নইলে তোমায় আমার সঙ্গে আমার কাছে নিয়ে যেতাম। ঠিক এই রকম একটি কমবয়সী বাঙালীর ছেলেই খুঁজছি আমি।'

সীতু কি রূঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল? তীব্র চীৎকারে প্রশ্ন করে উঠল, আমায় কী ভেবেছ তুমি? আমি চাকর?

না ওসব কিছু করল না সীতু।

ওসব কথা বোধকরি ওর কানেও ঢোকে নি। ও গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে।

এ কী!

এ কোথায় আসছে সে?

এই শিবমন্দির কোন পাড়ার? ওই গম্বুজ দেওয়া লাল বাড়ীটা কোন রাস্তায়? নীল কাঁচের জানলা বসানো ওই ফোটো তোলার দোকানটা? আর ওই সিনেমা বাড়ীটা? গাড়ী দ্রুত পার হতে থাকে আর সীতুর সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে।

একবার দরদর করে ঘাম ঝরেছিল, এখন একটা শুকনো দাহ।

বুঝতে পেরেছে সীতু, বুঝতে পেরেছে এবার।

এ সমস্তই ষড়যন্ত্র। ওই বৌটার বাপেরবাড়ী যাওয়াটাওয়া সব বাজে, সীতুকে ভুল বুঝিয়ে ফন্দী ফিকির করে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যেখানকার লোক রোজ 'এতবড় মোটর হাঁকিয়ে' হরসুন্দরী বাড়ীওলীর বাড়ী যায় সীতুকে খুঁজতে।

আগে থেকেই তা হলে তৈরি হয়ে আছে এই সব ব্যাপার। আর মা? সীতুর মা!

সন্দেহ নেই তিনিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন।

আর সীতু এমন বোকা যে তাতেই ভুলে—

উঃ!

মা নিজে যেতে পারলেন না, বেচারী সীতুর ওপর দিয়েই—

ওঃ ওঃ এই তো এসে গেছে···পার্কের রেলিঙ্ দেখা যাচ্ছে। পার্কটা পার হলেই—

সীতু জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে তীব্র প্রশ্ন করে 'এটা কোন রাস্তা? আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

এ প্রশ্নে গাড়ীর চালক পর্যন্ত ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। বৌ অবাক হয়ে বলে, 'কেন আমার বাপের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। সব্যসাচী রোডে যাবো। কেন তোমার মা বলেনি?'

কিন্তু ততক্ষণে স্তিমিত হয়ে গেছে সীতু, ততক্ষণে সন্দেহ সরে গেছে তার।

গাড়ীটা পার হয়ে গেছে ভয়ঙ্কর একটা ভয়ের জায়গা।

আতঙ্কটা ঘুচল।

কিন্তু আশা? যে আশা শিশুমনের অজ্ঞাত অবচেতনে জন্ম নিচ্ছিল পরিচিত পথের ছলনায়?

'এ রাস্তা তুমি চেন?'

সীতু মাথা নেড়ে বলে 'না'

গাড়ী নির্দ্দিষ্ট জায়গায় থামে। বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই অনেক ছোট বড় মাঝারি বয়সের মেয়ে-পুরুষ এসে কলকণ্ঠে সম্ভাষণ জানায়, একটি মধ্যবয়সী মহিলা সীতুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেই ফেলেন, 'এটি কে রে ছন্দা?'

এতক্ষণে সীতু জানতে পারে বৌটার নাম ছন্দা।

ছন্দা ওর দিকে একটি স্নেহদৃষ্টি ফেলে বলে, 'এ? এ হচ্ছে আমার শ্বশুরবাড়ীর নতুন বামুন দিদির ছেলে! বেবির চাকরটাকে নিয়ে আসিনি বলে ভাবলাম ওকেই বরং—'

গরম সীসে কানে ঢেলে দিলে কি কানে এর চাইতে দাহ হয়?

মধ্যবয়সী মহিলাটিও সস্মিত কণ্ঠে বলেন 'খাসা ছেলেটি! তোর শাশুড়ী জোটায়ও বেশ। বুড়োবুড়ি একা থাকে, এ বেশ নাতির মত—'

ছন্দা হেসে ওঠে, 'ও মা, সে আর বোলোনা! আমার শাশুড়ীর তো এমন ব্যবস্থা, নাতি কোথায় লাগে! দোতলার ঘর, খাট বিছানা, মশারি, টেবলফ্যান, পড়বার টেবিল চেয়ার—'

কথা শেষ হয় না, সমবেত হাস্যরোলে চাপা পড়ে যায়।

বামুনদি আর বামুনদির ছেলের জন্য এ হেন অভিনব ব্যবস্থা রীতিমত হাস্যকর বৈ কি। বামুনদির মনিব গিন্নীর পাগলামীর পরাকাষ্ঠা!

সীতু কি সকলের অলক্ষ্যে কোন এক সময় এই কুৎসিত কদর্য্য বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে যাবে?

কিন্তু এরা কি খারাপ?

এরা কি হৃদয়হীন? তা তো নয়।

ছন্দার মার এবার মেয়ের দিক থেকে নাতনীর দিকে মন যায়, হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নাতনী তারস্বরে আপত্তি জানায়। অনেক ভুলিয়ে কোলে নিয়েই ভদ্র-মহিলা যেন শিউরে ওঠেন, 'ও মা! মেয়ের সমস্ত শরীরটুকুই যে হাড়! কী মেয়ে, কী করে ফেলেছিস ছন্দা?'

ছন্দা মলিন ভাবে বলে, 'কত বড় অসুখে ভুগল তা বল? লিখেছিলাম তো সবই। একেবারে—যায় যায় অবস্থা হয়েছিল।'

যায় যায় অবস্থা!

যায় যায় অবস্থা!

সীতুর প্রত্যেকটি লোমকূপের মধ্যে থেকে কি ওই নতুন শেখা শব্দটা উঠছে?

যায় যায় অবস্থা!

ছন্দা তখনো বলে চলে, 'একদিন তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। পাড়ার সবাই আমায় বলতে লাগল, বেঁচে উঠেছে নেহাৎ তোমার কপাল জোরে।'

দিদিমা নাতনীর গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'বোশেখ মাসে স্বপ্না তোর ওখান থেকে বেড়িয়ে এসে তো আহ্লাদে কুটিকুটি, বলে, 'মা, দিদির মেয়েটা হয়েছে যেন মাখনের পুতুল! আর তেমনি হাসিখুসি—'

'হাসি-খুসি' ততক্ষণে সানাই বাঁশী বাজাতে সুরু করেছে।

দিদিমা বিরক্তচিত্তে বলেন, 'বাবা, আমার কাছে জন্মাল, মানুষ হল, এখন আমাকে একেবারে ভুল?'

ছন্দা মেয়ে কোলে নিয়ে অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'অসুখ করে পর্যন্ত ওই রকম মেজাজী হয়ে উঠেছে। এই তো ছেলেটাকে আনলাম, তা গেলে তো ওর কাছে! কি যেন তোমার নাম খোকা? সীতু না কি? সীতানাথ না সীতারাম?'

বলাবাহুল্য উত্তর পাওয়া তার ভাগ্যে ঘটে না।

ছন্দার মা বলেন, 'বড্ড দেখছি মুখচোরা। যাও খোকা, ওদিকে বাইরের বারান্দায় বোসোগে।'

বাইরের বারান্দা!

মুক্তির আহ্বান বহে আনছে কথাটা।

ছন্দার অনেকখানি সময় কেটে যায় অনেক কথায়, অনেক হুল্লোড়ে। স্বপ্না এসেছে, এসেছে স্বপ্নার বর। খুসির স্রোত বইছে।

হঠাৎ এই স্বচ্ছন্দ স্রোতে ঢিল পড়ে। ছন্দার মা এসে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করেন, 'তোর সঙ্গে যে ছেলেটি এসেছিল, কোথায় গেল বল দিকি? দেখতে পাচ্ছিনা তো। গণেশকে দিয়ে খেতে ডাকতে পাঠালাম, বলছে বাইরে দাওয়ায় নেই। রাস্তায়ও নেই—'

কিন্তু সত্যিই কি সীতু রাস্তায়ও নেই?

আছে। রাস্তাতেই আছে সীতু।

নেশাচ্ছন্নের মত পথ চলেছে।

তার চোখের সামনে শুধু বারেবারে ছায়া ফেলে ফেলে যাচ্ছে একটা তুলোর পুতুলের ধ্বংসাবশেষ! 'যায় যায়' অবস্থা হয়ে যে নাকি টিকটিকির মত হয়ে গেছে!

মূর্তিটা ঠিক গড়তে পারছে না সীতু, কি রকম যেন হারিয়ে যাচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে। তার পিছনে একটা ভীষণদর্শন দাঁতাল জন্তু উঁকি মেরে মেরে বলছে, 'ওরকম হলে বেঁচে যায় শুধু মায়ের কপাল জোরে বুঝলি?'

কিন্তু যার মা নেই? অবহেলায় ফেলে চলে গেছে?

সীতু কি জমাদারের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠবে?

কিন্তু তারপর?

অদৃশ্য হয়ে যাবার শিকড় কই তার? কই আর কুড়িয়ে পেল সে বস্তু? তবে?

সীতু কি নীচু হবে? ছোট হবে? বলবে 'একবার শুধু খুকুকে—'

ওরা যদি সকলে মিলে হেসে ওঠে?

বামুনদি, নেপ্‌ বাহাদুর, বাসন মাজা সেই ঝিটা?

সীতু কি তাহলে সোজা মাথা তুলে সেই মানুষটার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? স্পষ্ট গলায় বলবে, 'তুমি আমাদের খুঁজতে গিয়েছিলে কেন?' বলবে, 'খুকুর কি এখনো যায় যায় অবস্থা?'

কিন্তু সেই মানুষটা যদি ভয়ঙ্কর লাল লাল চোখে তাকায়? যদি ভারী ভারী গলায় বলে, 'খুকু নেই।'

টেলিফোন ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে শিবনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ী।

গিন্নি যথারীতি বলে ওঠেন, 'অ অতসী, দেখতো মা কে ডাকে—'

কিন্তু ততক্ষণে গিন্নীর পুত্ররত্ন কর্মভার হাতে তুলে নিয়েছেন। আর পরক্ষণ থেকেই তাঁর কণ্ঠযন্ত্র লহরে লহরে ঝঙ্কার তুলতে সুরু করেছে।

'অ্যাঁ! বল কি? কতক্ষণ?...আঃ কী মুস্কিল, তোমারও যেমন কাণ্ড! চেনো না জানো না, কী নেচারের ছেলে না খোঁজ করেই—'

ছেলে!

অতসী দরজার বাইরে আটকে যায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি বুঝি শ্রবণেন্দ্রিয়ে এসে ভীড় করে। কে কোথা থেকে খবর দিচ্ছে! কার ছেলের কথা বলছে? কী হয়েছে তার?

এদিকে তারযন্ত্র আর কণ্ঠযন্ত্র পাল্লা চালিয়ে যাচ্ছে...'আচ্ছা আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। যাচ্ছিলামই—কি বলছ? বিপদ? তা ইচ্ছে করে বিপদকে ডেকে আনলে সে আসবে বৈ কি!...কী বললে? গাড়ী চাপা? না না অতদূর ভাববার দরকার নেই। তোমার কল্পনা শক্তি দূরপ্রসারি বটে। আমার মনে হচ্ছে এখানে পালিয়ে এসেছে।'

এখানে!

তাহলে আর সন্দেহের অবকাশ নেই অতসীর, কোন ছেলের কথা হচ্ছে।

'কী হল? বাসে ট্রামে চড়তে জানে না? হুঁঃ! কলকাতার এই সব বামুন চাকর ক্লাসের ছেলেদের তো চেনো না? ওরা সাত বছর বয়স থেকে পাকা হয়ে ওঠে। আমি বলছি অত উতলা হবার কিছু নেই। ঠিক শুনবে দিব্যি বিকশিত দন্তে বিড়ি খেতে খেতে এখানে এসে হাজির হয়েছে...যাক আমি যাচ্ছি। তোমার যখন দায়িত্ব।'

অতসী কি ছুটে গিয়ে রিসিভারটা কেড়ে নেবে ওই হৃদয়হীন লোকটার হাত থেকে? না কি দুড়দুড়িয়ে নেমে গিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবে রাস্তায়?

কিন্তু তারপর?

মনিব গিন্নীর বেহাই বাড়ী কোন রাস্তায় সে কথা কি জেনে নিয়েছে অতসী? ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে চরম নিষ্ঠুরতার আঘাত হেনেছে সে সেই অবোধ অভিমানী বালক-চিত্তের উপর। আর কিছু করেনি। এখন অতসী 'ছেলে ছেলে' বলে উদ্‌ভ্রান্ত হলে ভগবান ভ্রূকুটি করবেন না?

'ফোন কে করছে রে খোকা?' অতসীর মনিবানী এগিয়ে আসেন, 'বৌমা বুঝি?'

'হ্যাঁ! যত সব ঝামেলা!' খোকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোমাদের যেমন কাণ্ড! বুদ্ধি-সুদ্ধি যদি কোন কালে হবে। খামোকা তোমার রাঁধুনীর না কার ছেলেকে ওদের ওখানে পাঠাবার কি ছিল? সে ছেলে নাকি ওখান থেকে হাওয়া।'

'ও মা! সে কী!' চোখ কপালে তোলেন ভদ্রমহিলা, 'ওখানে অচেনা পাড়ায় একা একা সে আবার কোথায় যাবে?'

'কোথায় যাবে তোমরাই জানো। এখন ছুটতে হবে আমাকেও। ভেবেছিলাম সন্ধ্যের দিকে যাবো। এখন তোমার বৌমা অস্থির হচ্ছে। বলছে, 'পরের ছেলে নিজের দায়িত্বে নিয়ে এসেছি!'

শিবনাথ-গিন্নী কাতর বচনে বলেন, 'এত সব আমি কি করে জানবো বাছা? বৌমা বলল নিয়ে যাই, আমি বললাম যেতে চায় তো নিয়ে যাও। মুখচোরা ছেলে। তা' অনিচ্ছেয় জোর করে নিয়ে গেছে নাকি—হ্যাঁ অতসী, তোমার ছেলে···কই গো, তুমিই বা কোথায় গেলে? অতসী···অ সীতুর মা। ও মা এই তো এখানে ছিল, সে আবার কোথায় গেল!··· এ সব কী ভূতুড়ে কাণ্ড গো! অ খোকা, দেখ দেখ ছেলে হারানো শুনে সে আবার রাস্তায় বেরিয়ে গেল কি না! ছেলে অন্ত প্রাণ! কিন্তু একা মেয়েমানুষ বেরিয়ে কি করবে? অ খোকা—ও মা আমি কেন মরতে তার ছেলেকে যেতে দিতে রাজী হলাম।'

মৃগাঙ্ক চুপচাপ বসে ভাবছিলেন, টেবিলে কনুই রেখে, চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে। একটু আগে রোগী দেখে ফেরার সময় একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে গেছে। অথচ এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না ঘটনাটা সত্যি কি না।

আসলে কিন্তু কোনও ঘটনা কি? না, ঘটনা বলতে কিছুই নয়, শুধু একটা চকিত ছায়া, একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়।

তখন থেকে বার বার ভাবছেন মৃগাঙ্ক, তিনি কি ঠিক দেখেছেন? না কি তাঁর একাগ্র বাসনা ছায়ামূর্ত্তি ধরে তাঁকে ছলনা করছে? কিন্তু ছলনাটা বড় অবিকল।

গাড়ীতে আসতে আসতে হঠাৎ দেখতে পেলেন পাশ দিয়ে একটা গাড়ী সাঁ করে বেরিয়ে গেল, তার মধ্যে সীতু।

সীতু এতবড় একখানা গাড়ীর আরোহী হয়ে বসেছে এটাও যেমন অবিশ্বাস্য, মৃগাঙ্ক সীতুকে চিনতে পারবেন না সেটাও তেমনি অসম্ভব।

কিন্তু সে গাড়ীতে আর কে ছিল?

দেখতে পাননি মৃগাঙ্ক, আদৌ দেখতে পাননি, দেখবার চেষ্টা করবার অবকাশও পাননি, শুধু যা দেখেছিলেন তাতেই দিশেহারা হয়ে গিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, আর সেই বিস্মৃতির মুহূর্ত্তে হঠাৎ গাড়ীটাকে আড়াল করে ফেলেছিল প্রকাণ্ড একটা লরী। আর ট্রাম চলছিল এপাশ দিয়ে।

লরীর শত্রুতাপাশ থেকে উদ্ধার হয়ে যখন কোন রকমে নিজের গাড়ীখানা উদ্ধার করলেন মৃগাঙ্ক, তখন সেই 'মায়ামৃগ' মিলিয়ে গেছে ধূসর শূন্যতায়।

গাড়ীর নম্বরটাও দেখে নেবার সুবিধে হয় নি। এখন মাথায় হাত দিয়ে ভাবছেন মৃগাঙ্ক—যা দেখেছেন তা কি সত্যি? সত্যি হওয়া সম্ভব?

না প্রখর সূর্য্যালোকের মাঝখানে দিবাস্বপ্ন ?

শিবপুরের হরসুন্দরী দেবীর বাড়ী আর যাওয়া হয়নি। অনবরত যেতে যেতে ভয়ানক একটা কুণ্ঠা আসছিল। আর শেষদিন তো ভদ্রমহিলা প্রায় ক্ষেপেই উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'মিথ্যে আপনি খোঁজাখুঁজি করছেন। যে মেয়েমানুষ কোলের কচি বাচ্চা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, সে আবার ঘরে ফেরে নাকি ? আপনার যে এখনো তার ওপর রুচি আছে, এই আশ্চর্য্যি। জানি না আপনার কে হয়, তবে মুখের ওপরই বলছি—তাদের নিয়ে ঘর করা সম্ভব নয়। নইলে আমি কি কম ইয়ে করেছিলাম বাবা—'

ভয়ানক একটা লজ্জা হয়েছিল সেদিন মৃগাঙ্কর।

আর ভেবেছিলেন সত্যিই তো ইচ্ছে করে যে হারিয়ে থাকতে চায়, তাকে খুঁজে বার করা কি সহজ ? আর খুঁজে বার করে লাভই আছে না কি কিছু ?

কিন্তু এতটা করবার কি সত্যিই দরকার ছিল অতসীর ? এই নিষ্ঠুরতা কি সম্পূর্ণ অর্থহীন নয় ? ছেলে নিয়ে আলাদাই যদি থাকতো, মৃগাঙ্কর ব্যবস্থা না নিতো, তাই হোতো। কিন্তু একটু ঠিকানা, একটু সন্ধান, বেঁচে আছে কি মরে গেছে তার একটু খবর, এটা জানাতে দোষ কি ছিল ?

খবরের আশায় শ্যামলীদের বাড়ী গিয়েও আর বিব্রত করতে ইচ্ছে হয় না, ইচ্ছে হয় না খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। তবু নিজের নাম না দিয়ে একটা আবেদন করেছিলেন কয়েকটা সপ্তাহের কাগজে, 'অতসী, অন্ততঃ খবর দাও কোথায় আছো।' সাড়া এল না তার। অতসী যে খবরের কাগজের জগৎ থেকে অনেক দূরের গৃহে বাস করছে, সেটা ভাবেননি মৃগাঙ্ক। ভেবেছেন ইচ্ছাকৃত।

ক্রমশঃই শিথিল হয়ে যাচ্ছিলেন মৃগাঙ্ক, কঠিন করে তুলতে চেষ্টা করছিলেন মনকে, কিন্তু আজ আবার এ কী আলোড়ন !

মৃগাঙ্ক কি আবার শিবপুরে যাবেন ?

আবার নির্লজ্জের মত বলবেন, কোন ছলে কোন প্রয়োজনে তারা কি আবার এসেছিল ?

যদি সেই প্রৌঢ়া মহিলা ধিক্কারে ছিঃ ছিঃ করে ওঠেন ! সইতেই হবে সেই ধিক্কার।

তবু জানতে চেষ্টা করতে হবে মৃগাঙ্ককে, সীতু কার সঙ্গে গাড়ী চড়ে চলে গেল, অতসী কোথায় রইল।

তখন সামনে আড়াল করে দাঁড়ান সেই লরিটাকে যদি মৃগাঙ্ক ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে বিলুপ্ত করে দিতে পারতেন !

চলমান সেই গাড়ীখানার নম্বরটা টুকে নিতে পারলে মৃগাঙ্ক কি এখন এমন করে বসে থাকতেন যন্ত্রণায় খাক হয়ে ?

কিন্তু সত্যিই কি সীতু?

অস্নাত অভুক্ত মৃগাঙ্ক আবার গাড়ী বার করবার আদেশ দিলেন।

দিনের আলোয় সম্ভব নয়।

মনে হয় সমস্ত পৃথিবী ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। পার্কের কোণের দিকে গাছের আড়ালে ঢাকা একটা বেঞ্চে বসে থাকে সীতু সন্ধ্যার অন্ধকারের অপেক্ষায়। দুঃসহ হচ্ছে প্রতীক্ষার প্রহর, অথচ দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে ইচ্ছে।

সীতু এখন ভেবে পাচ্ছে না ছোট্ট সেই পুতুলটা, যে সীতুকে দেখলেই 'দাদ্‌দা দাদ্‌দা' বলে ছুটে আসতো, তাকে এতদিন একবারও না দেখে কি করে ছিল সীতু!

খুকুটা যদি পার্কে আসে!

সেই লাল সিল্কের নীচে থেকে নেমে আসা মোট্টা মোট্টা গোল গোল পা দু'খানা নিয়ে থপ্‌থপিয়ে হেঁটে ছুটে আসে সীতুর দিকে। সেই নরম ফুলের বস্তাটাকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নেবার দুরন্ত আকুলতাটাকে সীতুকে ভুলিয়ে দেয়, তার নাকি 'মরণ বাঁচন' অসুখ হয়েছিল, যায় যায় অবস্থা হয়েছিল।

আস্তে আস্তে দুপুরের রোদ ঢলে পড়ে। প্রায় ঢলে পড়ে সীতুও।

পেটের মধ্যে খিদেয় পাক দিচ্ছে। সামনে দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে অবাক জলপান, ঘুগনিদানা' ঝালমুড়ি, আইসক্রীম।

ওদিকে সীতুর তাকাতে নেই।

কিন্তু যখন তাকাতে ছিল?

তখন কি তাকাতো সীতু?

না, সীতু শুধু মুখ বিষ করে বসে থাকতো বেঞ্চে। নেহাৎ চাকরদের সঙ্গে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত তাকে পার্কে, তাই আসতো।

আজ পার্কের বেঞ্চে বসে থাকতে থাকতে সীতুর হঠাৎ মনে হয়, আচ্ছা সীতু সব সময় অমন বিশ্রী হয়ে থাকতো কেন? থাকে কেন?

জগতে এত ছেলে, আহ্লাদের সাগরে ভাসছে যেন—সীতু কেন পারে না সে সাগরে ভাসতে!

পারেনা মৃগাঙ্ক ডাক্তারের উপর আক্রোশে আর বিতৃষ্ণায়? কিন্তু মৃগাঙ্ক ডাক্তার কি সত্যিই অত খারাপ? যদি অত খারাপ, তাহলে কেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন সীতুকে আর সীতুর মাকে?

সীতুরা তো তাঁকে অপমানের চূড়ান্ত করেছে।

নিজের বাবা না হলে কি হয়? কি হয় তাকে 'বাবা' বলে ডাকলে!

অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সীতু।

যে বাড়ীতে তারা থাকতো, সে বাড়ীর কর্তা বুড়োটা তো তার নিজের দাদু নয়। তবু তো সীতু তাদের বাড়ী থাকে, তাকে 'দাদু' বলে। অতসী বলে 'বাবা।' বুড়িটাকে বলে 'মা।'

কিন্তু কই তাতে তো রাগ হয় না সীতুর, অপমান বোধ করে না অতসী।

তবে কেন সীতু মৃগাঙ্কর বেলাতেই—?

সীতুই খারাপ, সীতুই যত নষ্টের মূল। সীতুর জন্যেই সীতুর মাকে রাজরাণী থেকে ঘুঁটে কুড়ুনি হতে হয়েছে! হরসুন্দরীর বাড়ীর মতন বিচ্ছিরি বাড়ীতে থাকতে হয়েছে, লোকেদের বাড়ীতে ঝি হতে হয়েছে।

এ বাড়ীটায় বিচ্ছিরি ঘর নয়, কিন্তু ভাল ঘরে রেখেও কী বলে ওরা সীতুর মাকে? রাঁধুনী! রাঁধুনী! বামুনদির মত ভাবে সীতুর মাকে!

নিজের মাকে ঝি করেছে সীতু, রাঁধুনী করেছে। মৃগাঙ্ক খুব খারাপ লোক নয় তবু তাঁকে কষ্ট দিয়েছে, অপমান করেছে।

আর খুকুকে?

খুকুকে সীতু?

খুকুকে সীতু মেরে ফেলেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ মেরেই ফেলেছে। খুকুর মাকে কেড়ে নিয়েছে সীতু, কেড়ে নিয়েছে মায়ের 'কপাল জোর।'

তবে মেরে ফেলা ছাড়া আর কি?

শার্টের ঝুলটা তুলে মুখে চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠাটা রোধ করে সীতু। তারপর, অনেকক্ষণের পর আস্তে আস্তে বেঞ্চ থেকে নামে।

খুকু পার্কে আসবে এ আশা আর নেই সীতুর। খুকু যেন একটা বিভীষিকার ছায়া নিয়ে ঝাপ্‌সা হয়ে আছে।

তবু—

তবু সীতু—

সন্ধ্যার অন্ধকারে জমাদারের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই সরু বারান্দাটা পার হয়ে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে একবার দেখে নেবে খুকুর খাটটায় কেউ শুয়ে আছে কি না। টিকটিকির মত রোগা কাঠির মত রোগা যাহোক।

আর যদি সেখানে কিছু না থাকে?

যদি দেখে খাটটা খালি, খাটের পায়ের কাছের সেই ছোট্ট নীচু আনলাটা খালি! আনলার তলায় সাজানো নেই লাল নীল সবুজ ছোট্ট ছোট্ট জুতো, আর খাটের ধারে ঝোলানো নেই রঙিন রঙিন তোয়ালে!

কী করবে সীতু?

কী করবে তখন? কী করবে তা জানে না। আর বেশী ভাবতে পারছে না। শুধু জানে সীতুকে যেতেই হবে।

খুকুর সম্পর্কে ভয়ঙ্কর একটা দাঁতখিচোনো অন্ধকারের ভয় নিয়ে টিঁকতে পারবে না সীতু।

হরসুন্দরী কপালে করাঘাত করে বলেন, 'আগে কি করে জানবো বলুন এখনও এই চত্বরে আছে তারা! পাড়ার ইস্কুলেই পড়ছে। ইস্কুলের কথা আমার মাথায় আসেনি। সেদিন যেদিন শেষ এসেছিলেন, আপনিও গেলেন, আমিও ঘুরে দেখি সামনে মূর্ত্তিমান। তা' দাঁড়ায় একদণ্ড? আপনার কথা বলতে গেলাম। কানেই নিলনা! ঠিকরে চলে—'

'স্কুলটা দেখিয়ে দিতে পারেন?'

ইস্কুল তো ওই---ও রাস্তার মোড়ে। 'জগদীশ স্মৃতি বয়েজ ইস্কুল।' কিন্তু এখন তো ইস্কুল বন্ধ, পুজোর ছুটি পড়ে গেছে।'

পুজোর ছুটি পড়ে গেছে।

দ্বারোয়ান সুদ্ধু দেশে চলে গেছে।

মাষ্টারদের ঠিকানা?

সে আবার আশপাশের কে জেনে মুখস্থ করে রেখেছে?

শূন্যগাড়ী নিয়ে ফিরে আসেন মৃগাঙ্ক। ফিরে আসেন শিবনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ীর সামনে দিয়ে। যখন টেলিফোনে ওরা সীতুর অন্তর্ধান বার্ত্তা বলাবলি করছে। যার একমিনিট পরে গাঙ্গুলী গিন্নী অতসীকে খুঁজে পাননি।

কিন্তু মৃগাঙ্ক কি ক্রমশঃ পাগল হয়ে যাচ্ছেন?

জলাতঙ্ক রোগী যেমন জলের দিকে তাকালেই লক্ষ লক্ষ কুকুরের ছায়া দেখতে পায় মৃগাঙ্ক কি তেমনি, সর্ব্বত্র তাঁর পরম শত্রুর ছায়া দেখতে পাচ্ছেন?

নইলে এই ঘণ্টাকয়েক আগে কতটা দূরে যে মূর্ত্তি একখানা চলন্ত গাড়ীতে দেখেছিলেন সেই মূর্ত্তিতে কেন বসে থাকতে দেখবেন পার্কের মধ্যেকার একটা বেঞ্চে?

এও চকিত ছায়া?

দূর রাস্তা থেকে চলন্ত গাড়ীতে বসে দেখা!

গাড়ী পিছিয়ে আনলেন মৃগাঙ্ক, নামতে উদ্যত হলেন, তারপর সহসাই সামলে নিলেন নিজেকে। ভ্রান্ত দৃষ্টির বিভ্রান্তিতে ভুলবেন না আর মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্ক বুদ্ধিমান।

কিন্তু আশ্চর্য্য, সর্বত্র অতসীর ছায়া দেখছেন না মৃগাঙ্ক, দেখছেন কিনা সীতুর!

এই জন্যই কি মহাপুরুষরা বলেন 'ঈশ্বরকে শত্রু রূপে ভজনা কর।'

কিন্তু সেই হতভাগ্য বুদ্ধিভ্রংশ ছেলেটাকে কি আর এখন নিজের প্রতিপক্ষ বলে মনে হয় মৃগাঙ্কর। মনে হয় শত্রু বলে?

হরসুন্দরী বাড়ীওয়ালার ঘর দেখবার পরেও?

সেই বাড়ীরও ভাড়া জোগাতে পারেনি বলে চলে গেছে অতসী। কোথায় তবে গেছে? আরও কত সঙ্কীর্ণ গলিতে? আরও কত জঘন্য ঘরে?

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে অনেক পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ী ফিরে এলেন মৃগাঙ্ক।

আস্তে আস্তে উঠে গেলেন ওপরে। ভুলে গেলেন আজ অভুক্ত আছেন।

ঘরটা এখনও অন্ধকার।

অন্ধকারেই একবার শুয়ে পড়লে হয়। শুধু তার আগে একবার স্নানের দরকার।

বাইরের পোষাক ছেড়ে বাথরুমের দিকে এগিয়েই জমাদারের সিঁড়ির দিকে চোখ পড়ল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সহসা একটা বিকৃত আর্ত্তনাদ করে পড়ে গেলেন মৃগাঙ্ক, ঘর থেকে বাথরুমে যাবার প্যাসেজটায়।

মৃগাঙ্ক এবার বুঝতে পেরেছেন পাগল হয়ে যাচ্ছেন তিনি। সেই বুঝতে পারার মুহূর্ত্তে এই আর্ত্তনাদ।

তারপর চলে গেল সেই বোধশক্তিটুকুও।

পড়ে গেলেন। মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন সরু প্যাসেজটায়।

সারাদিন শ্যামলী কাছে রাখে মেয়েটাকে।

মেয়েটারও অসুখ থেকে উঠে পর্যন্ত শ্যামলীর ওপর ভয়ঙ্কর একটা ঝোঁক হয়েছে। তার কাছে ছাড়া নাইবে না, খাবে না, ঘুমোবে না।

শ্যামলীরও এ এক পরম আনন্দ। সারাদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় এ বাড়ীতে নিয়ে আসে তাকে, তা'ও বেশীরভাগ দিনই ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে ফিরতে পায়।

আঁচল ধরে আগলায় খুকু। বলে, শ্যাম্মী যাবেনা। শ্যাম্মী থাকবে। খুকুকে গপ্পো বলবে।' নিজের ছেলেটার অযত্ন হয় তবু শ্যামলী পারেনা তাকে বিমুখ করতে।

আজও যথারীতি সন্ধ্যার পর খুকুকে নিয়ে পথে পা দিয়েছে শ্যামলী, আর যেন ভূত দেখে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'কে? কে দাঁড়িয়ে? সীতু না? তুই এখানে? একা যে? মা কই?'

সীতু কাঁপছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। তা'র বুকের ওঠাপড়া বুঝি দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে।

'মা কই, বল লক্ষ্মীছাড়া ছেলে? বল। মরে গেছে বুঝি? মাকে মেরে ফেলে—'

চেঁচিয়ে ওঠে শ্যামলী।

আর সীতু শার্টের ঝুলটা তুলে মুখে চেপে কেঁদে ওঠে 'মা আছে, বাবা মরে গেছে।'

'কে মরে গেছে?' চেঁচিয়ে ওঠে শ্যামলী।

'বাবা!' ক্লান্ত ভাঙ্গা গলায় বলে সীতু। খুকু যে টিকটিকির মতন হয়ে গিয়েছে, কাঠের মতন হয়ে গিয়েছে এ বুঝি আর দেখতে পাচ্ছেনা সীতু।

তার সমস্ত চৈতন্যই আচ্ছন্ন করে রয়েছে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

একদা অহরহ যে লোকটার মৃত্যু কামনা করেছে সীতু, তার মৃত্যু যে সীতুর কাছে এমন ভয়ানক যন্ত্রণাকর হতে পারে, এ সীতুর বোধের বাইরে, ধারণার বাইরে।

সীতুর সমস্ত শরীরটাকে চিরে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেললে যদি সেই মুখ গুজড়ে পড়ে থাকা মানুষটা উঠে বসে তো এক্ষুনি সীতু নিজেকে চিরে ফেঁড়ে শেষ করে ফলতে পারে।

এ বাড়ীতে তখন ভয়ঙ্কর একটা ছুটোছুটি চলছে। সারাদিনের অভুক্ত সাহেবকে এখন 'খানা' দেওয়া হবে কি না জিজ্ঞেস করতে এসে নেপ্‌বাহাদুর এমন একটা আর্ত্তনাদ করে উঠেছে যে, বাড়ীতে যতগুলো লোক ছিল সবাই ছুটে এসেছে মৃগাঙ্কর শোবার ঘরে।

কিন্তু 'লোক' মানে তো চাকর বাকর?

আর কে লোক আছে মৃগাঙ্কর বাড়ীতে? হয়তো বাড়ীর কাজের ব্যাপারে ওরা বুদ্ধিমান—নেপ্‌বাহাদুর, মাধব, বামুনদি, কানাই, সুখদা। কিন্তু এমন একটা আকস্মিক বিপদপাতে তারা বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেছে। সকলে মিলে জটলাই করছে, খেয়াল করছে না একজন ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন।

বামুনদি আর সুখদা তারস্বরে মুখে চোখে জল দেবার নির্দ্দেশ দিচ্ছে আর ওরা এঘর ওঘর ছুটোছুটি করছে।

নাটকের এই জটিল দৃশ্যের মাঝখানে সহসা এসে দাঁড়াল শ্যামলী, যথারীতি খুকুকে নিয়ে। কিন্তু তার পিছনে ও কে?

ওই ছেলেটা!

আধ ময়লা নীল ডোরাকাটা সার্ট আর বিবর্ণ খাকি প্যাণ্ট পরা!

এতগুলো লোকের এত জোড়া চোখ যেন পাথর হয়ে গেছে। সাহেবের জ্ঞানশূন্যতার মত ভয়ঙ্কর বিপদটাও ভুলে গেছে ওরা। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওই ছেলেটার দিকে।

কিন্তু ছেলেটা তো শুধু শ্যামলীর পিছন পিছন নীরবে এসে দাঁড়ায়নি, বসে পড়েছে ঘরের মেজেয়। মৃগাঙ্কর অচৈতন্য দীর্ঘ দেহখানাকে কোনরকমে টেনে এনে মাথার তলায় একটা বালিশ গুঁজে শুইয়ে রেখেছে ওরা।

খুকুকে সুখদার কোলে ছেড়ে দিয়ে শ্যামলীও বসে পড়ে রুদ্ধশ্বাসে বলে 'কী হয়েছে?'

সবগুলো লোক একসঙ্গে 'কী হয়েছে' বোঝাতে চেষ্টা করে সবটাই দুর্বোধ্য করে তোলে। আর সেই গোলমাল ছাপিয়ে একটা তীব্র বেদনার্ত্ত ভাঙা গলা গুমরে ওঠে, 'মরে গেছে, বাবা মরে গেছে।'

'আঃ সীতু থাম্! ওকি বিচ্ছিরী কথা? ছিঃ ছিঃ!' শ্যামলী বকে ওঠে, 'দেখতে পাচ্ছিস না অজ্ঞান হয়ে গেছেন।...এই তোমরা শুধু গোলমাল করছ কেন? একটা ডাক্তার ডাকতে পারনি?'

ডাক্তার!

তাই তো!

ডাক্তার সাহেবের বাড়ীর লোক তারা, বাইরের ডাক্তারের কথা মনে পড়েনি।

কাকে ডাকবে তা'হলে?

কোন ডাক্তারকে?

সাহেবের তো চিনা জানা অনেক ডাক্তার বন্ধু আছে। কিন্তু কে তাদের নাম জেনে রেখেছে?

শ্যামলী হঠাৎ মুখগুঁজে বসে থাকা সীতুকে একটা ঠেলা দিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে' 'এই সীতু শোন্। তুই জানিস কাকাবাবুর কোথাও ডাক্তার বন্ধুর নাম?'

সীতু বিভ্রান্তের মত মুখ তুলে তাকায়। তার পর সমস্ত পরিস্থিতিটার উপর চোখ বুলোয়। এই তার সেই আশৈশবের পরিচিত জগৎ। ওই টেবলের উপর টেলিফোন যন্ত্রটা, ওই তার পাশে গাইড্ বুক।

যখন আরো ছোট ছিল, যখন সীতু ওই অসহায় ভাবে এলিয়ে পড়ে থাকা মানুষটাকে 'বাবা' বলেই জানতো, তখন একদিন অতসী বলেছিল, 'দাওনা একে ফোন করতে শিখিয়ে। ভারী কৌতূহল বেচারার।'

তখনো সম্পর্কে অত তিক্ততা আসে নি, তখনো মৃগাঙ্ক 'এই যে সীতুবাবু—' বলে ডেকে কথা বলতেন। তাই অতসীর অনুরোধ রেখেছিলেন, কাছে ডেকে বলেছিলেন, 'এই দেখ। এই ভাবে নম্বর ঘোরাতে হয়। আর এই বই দেখে দেখে লোকেদের নাম বার করতে হয়। এখন তুমি ইংরিজি পড়তে পারনা, যখন পড়তে পারবে তখন সব বুঝতে পারবে। আচ্ছা এখন দেখ—'

নমুনা স্বরূপ নিজের একজন সহকারী ডাক্তারকে ডেকেছিলেন মৃগাঙ্ক। আর একটু হেসে সীতুর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'দেখ, শিখলে তো? এখন ধর যদি হঠাৎ আমার কোনদিন বেশী অসুখ করে গেল, আমি আর কথা বলতে পারছি না, তুমি এই ভাবে ডাকবে,— 'ডাক্তার মিত্র আছেন? ডাক্তার মিত্র?...হ্যাঁ, আমি ডাক্তার মৃগাঙ্ক ব্যানার্জির বাড়ী থেকে বলছি—'

মানুষ কি কোনও একটা মুহূর্ত্তে হঠাৎ এক একটা বয়সের সীমা অতিক্রম করে? শৈশব থেকে বাল্যে, বাল্য থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্দ্ধক্যে? সীতু সহসা এই মুহূর্ত্তে অতিক্রম করে গেল তার শৈশবকে? তাই শ্যামলীর একবারের ডাকেই উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল

টেবিলের দিকে, 'গাইড্' দেখে বার করল প্রার্থিত নাম, আর ভাঙা গলায় আস্তে আস্তে থেমে বলতে থকেল—'ডাক্তার মিত্র আছেন? ডাক্তার মিত্র। আমি ডাক্তার মৃগাঙ্ক ব্যানার্জির বাড়ী থেকে বলছি…হ্যাঁ…বাবা! হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এক্ষুনি আসতে হবে।'

হ্যাঁ, হঠাৎ একদিন বেশী অসুখ করে গেছে মৃগাঙ্কর, কথা বলতে পারছেন না, তাই সীতু—সীতু পারছে। সীতু এখন ইংরিজি শিখেছে।

কিন্তু সীতু কি শুধু ইংরিজিই শিখেছে?

আরও কিছু বুঝতে শেখেনি? বুঝতে শেখেনি নিজের হিংস্র নিষ্ঠুরতা? যে নিষ্ঠুরতায় এই রাজবাড়ীর রাণীকে ভিখিরির সাজ সেজে পরের বাড়ী দাসত্ব করতে হচ্ছে, ওই চির কঠিন শক্তিমান লোকটা জীর্ণ হতে হতে ক্ষয়ে যাচ্ছে, আর—আর খুকু—

খুকু!

এতক্ষণে বুঝি মনে পড়ে সীতুর খুকুর কথা। যখন জ্ঞান ফেরার পর ঔষধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমোচ্ছেন মৃগাঙ্ক। তাঁর শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠাপড়া দেখা যাচ্ছে।

শ্যামলীর কাছে এসে দাঁড়ায় সীতু।

অস্ফুট দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলে, 'খুকু কোথায়?'

'খুকু!'

শ্যামলী এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও হঠাৎ হেসে ফেলে বলে, 'খুকু কোথায় কিরে? এই তো খুকু। চিনতে পাচ্ছিস না?'

নিজের কোলের দিকে চোখ ফেলে শ্যামলী বলে, 'কিছুতে ঘুমুতে চাইছে না। আসল কথা কাঁচা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে তো? তাই দেরী হচ্ছে।'

কিন্তু এত কথা কে শোনে?

সীতু অবাক বিস্ময়ের বিস্ফারিত লোচনে তাকিয়ে থাকে শ্যামলীর ক্রোড়স্থিত জীবটার দিকে। ওইটা খুকু? ওই রোগা সিরসিরে ঢ্যাঙা ন্যাড়ামাথা, সত্যিই টিকটিকির মত মেয়েটা খুকু? ওকে তো এই এতক্ষণ ধরে শ্যামলীরই মেয়ে ভাবছিল সীতু।

সেই লাল লাল খ্যাঁদা খ্যাঁদা মুখ আর সোনালি চুলওয়ালা খুকুটা তা'হলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে? আর তার হত্যাকারী সীতু!

'ও কার খুকু?'

তীক্ষ্ণ প্রশ্নে বিদীর্ণ করে ফেলতে চায় শ্যামলীকে সীতু। 'বল না কার খুকু?'

'কী মুস্কিল! কার আবার, তোদেরই। সত্যি চিনতে পাচ্ছিস না!'

সীতু আস্তে মাথা নাড়ে।

'তা' চিনতে আর পারবি কোথা থেকে।' শ্যামলী আপেক্ষ করে—'চেনবার কি জো আছে? এমনিই তো কতদিন দেখা নেই। তাছাড়া—যা হয়েছিল!'

শ্যামলী খুকুর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে সস্নেহে বলে—'সবচেয়ে শক্ত টাইফয়েড্। আর তার মধ্যে জ্বরের ঘোরে অবিরত শুধু 'মা মা' বলে—হ্যাঁ, এইবার বল দিকি তোদের খবর? এতক্ষণ তো—তিনিই বা কোথায়? তুই বা কোথা থেকে—'

মৃগাঙ্ক যখন চোখ মেললেন তখন সকাল হয়ে গেছে। চোখ মেলেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। তা'হলে কি ভুল নয়? সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন তিনি?

যদি পাগল না হন, তা'হলে বিশ্বাস করতে হয় তাঁর ঘরে তাঁরই বিছানার কাছাকাছি অতসীর খাটটায় পড়ে যে ছেলেটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে, সে সীতু!

আর সীতুর গা ঘেঁসে, সীতুর গায়ে হাত পা বিছিয়ে অকাতরে পড়ে ঘুমোচ্ছে যে, সেটা খুকু!

চুপ করে এই দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে রইলেন মৃগাঙ্ক। ডাকলেন না। যেন ডাক দিলেই এই অপূর্ব্ব পবিত্রতার ছবিখানি অপবিত্র হয়ে যাবে।

তা'হলে কাল ছায়ামূর্ত্তি দেখেন নি মৃগাঙ্ক?

কিন্তু কোথা থেকে এল ও?

কে ওকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করে গেল?

কিন্তু একা কেন?

অতসী কোথায়?

তবে কি অতসী—তাই ছন্নছাড়া ছেলেটা পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে—কেঁপে উঠলেন মৃগাঙ্ক। ভুলে গেলেন, এই ছবিখানি নষ্ট করতে চাইছিলেন না।

ডেকে উঠলেন।

হয়তো আকস্মিকতায় একটু বেশী জোরালো হল সে ডাক।

চমকে চোখ মেলে চাইল সীতু। উঠে বসল।

চোখ নামাল।

মৃগাঙ্ক মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে গম্ভীর মৃদু স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'তুমি একা এসেছ?'

সীতু চোখ তুললো, 'হ্যাঁ।'

'তোমার মা মারা গেছেন?'

'না না, ওকি!' শিউরে ওঠে সীতু।

'তবে?'

সীতু প্রতিজ্ঞা করেছে এবার থেকে সে সভ্য হবে, ভদ্র হবে, কেউ কথা বললে উত্তর দেবে। তাই ক্ষীণস্বরে বলে, 'আমি এমনি একা—খুকুকে দেখতে—'

'খুকুকে দেখতে। খুকুকে দেখতে এসেছ তুমি!'

'হ্যাঁ'।

এবার আর হরসুন্দরীর বাড়ীর দরজায় নয়।

শিবনাথ গাঙ্গুলীর দরজায় এসে থামে সেই মস্ত চকচকে গাড়ীখানা।

কাকে চাই?

এ বাড়ীর রাঁধুনীকে!

যেন রূপকথার গল্প! ঘুঁটে কুড়ুনির জন্যে চতুর্দ্দোলা!

কিন্তু এখানেও কপালে করাঘাত। 'এই দু'দিন আগেও ছিল বাবা! হঠাৎ 'ছেলে ছেলে' করে বিভ্রাট হয়ে—গোড়া থেকেই বুঝেছি আমি, সে যেমন তেমন নয়, শাপভ্রষ্ট দেবী আমাকে ছলনা করতে এসেছিস।...কিন্তু তুই দুষ্টু ছেলে হঠাৎ অমন করে কোথায় চলে গিয়েছিলি? ছেলে হারিয়েছে শুনেই তোর মা যে পাগলের মত—'

কিন্তু মৃগাঙ্ক আর পাগলের মত হ'ননা। হবেন না।

ফিরে এসে সীতুকে হাত ধরে গাড়ীতে তুলে দিয়ে নিজে উঠে স্টার্ট দিতে দিতে গম্ভীর মৃদুকণ্ঠে বলেন, 'কাঁদিসনে সীতু, কাঁদলে চলবে না। খুঁজে তাকে আমরা বার করবোই। খুঁজে না পেলে চলবে কেন আমাদের বল! কিন্তু আর আমার ভয় নেই। তখন একা ছিলাম, তাই হেরে গিয়েছিলাম, আর তো আমি একা নই? আর হারবো না। দেখবো আমাদের দু'জনকে হারিয়ে দিয়ে, কতদিন সে হারিয়ে বসে থাকতে পারে!'